অভীক সরকার

মহাদেবী



মহাদেবী

সম্পূর্ণ ক্যাটালগ পেতে
QR Code স্ক্যান করুন

অভীক সরকার

মহাদেবী



পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২৪ তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২৪ চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০২৪

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

MAHADEVI
Historical Novel *by* Avik Sarkar
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-93-95635-50-9

শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুলেখক
সোমনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়কে,
যিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কখনও
আমার হাত ছেড়ে যাননি।

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

পটমঞ্জরী
পেতবত্থু
খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ

আজ থেকে মাস ছয়েক আগে হঠাৎ একদিন আমার এক সুহৃদ ফোন করে বললেন, 'একটা দারুণ হিস্টোরিকাল প্লট পেয়েছি। তুমি লিখবে?' তখনও 'পটমঞ্জরী' লেখার আবেশে বুঁদ হয়ে আছি। ইচ্ছে করছে আরও কিছু ইতিহাস সংক্রান্ত গল্প বা উপন্যাস লিখতে। শুনে ভারি আগ্রহ বোধ করলাম। তাই তাঁকে অনুরোধ করলাম বলার জন্য।

সুহৃদ তখন আমাকে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পট্টমহিষী ধ্রুবস্বামিনীর বহুল প্রচলিত প্রেমের কাহিনি শোনালেন। শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। প্রেম এবং বীরত্ব, দুইই আমার প্রিয় বিষয়। আর তার সঙ্গে কাহিনির বীজে লুকিয়ে থাকা বহুতর সম্ভাব্য সাবপ্লটের উঁকিঝুঁকিও আমার নজর এড়ায়নি। একবার ভাবলাম লিখেই ফেলি। যদিও মনে সংশয় ছিল, এমন চমৎকার কাহিনিটি নিয়ে আজ অবধি কি কেউ কোনও উপন্যাস লেখেননি!

একটু খোঁজখবর করতেই জানলাম যে মূল কাহিনি বহুবিখ্যাত। বিশাখদত্ত'র একটি নাটক, নাম দেবীচন্দ্রগুপ্তম, সেখানেই এই কাহিনির উৎপত্তি। কাহিনিটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক আবেদন নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শৌর্যবীর্যের এই চিরকালীন গাথা তুলনাহীন। ফলে অনেক চিন্তাভাবনার পর আমার উপন্যাস নির্মাণে হাত দেওয়া গেল।

যে কোনও ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের মতোই এখানে আমি কল্পনার যদৃচ্ছ আশ্রয় নিয়েছি। কাহিনির প্রয়োজনেই বহুতর চরিত্রের, বহুতর কল্পিত ঘটনার আগমন ঘটেছে। পাঠকদের অনুরোধ, একে ইতিহাসের টেক্সট হিসেবে না পড়ে একটি উপন্যাস হিসেবেই পড়বেন।

প্রথমে এই কাহিনির নাম দিয়েছিলাম 'ধ্রুবস্বামিনী'। তারপর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিই 'মহাদেবী'। এখানে 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম'-এর মূল কাহিনি আরও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি উপকাহিনির শাখা-প্রশাখা। অবশেষে সেই মিলিত ধারা বেগবান কলস্বিনীতে পরিণত হয়েছে।

বইটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক পত্রভারতীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আশা করি ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, বীরত্ব, এবং সর্বোপরি মহৎ প্রেম ও অপ্রেমের এই গৌরবময় গাথাটি আপনাদের ভালো লাগবে।

অলমিতি।

অভীক সরকার

পয়লা জানুয়ারি, ২০২৪
দমদম, কলকাতা।

মধ্যগ্রীষ্মের নিদাঘখর দ্বিপ্রহর। মার্তণ্ডদেব যেন সহস্র অগ্নিজিহ্বা দিয়ে এই ধরিত্রীকে দহন করতে উদ্যত হয়েছেন। পথঘাট জনশূন্য। আকাশে কোনও পাখি নেই। বৃক্ষরাজি ম্রিয়মাণ, তৃণদল হরিদ্রাভ বর্ণ। ওই দূর পর্বতের দিকে তাকালে মনে হয় সামনের দৃশ্যাবলী যেন ছায়াচিত্রের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। কোথাও কোনও আনন্দ নেই, প্রাণের সাড়া নেই, জীবনের স্পন্দন নেই।

এই পার্বত্য প্রদেশের আবহাওয়া বড়ই চরমভাবাপন্ন। দিবাভাগ যেমন নিষ্করুণ, রাত্রি তেমনই নির্মম। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নির্জন শৈত্য ঘিরে ধরে এই ভূভাগকে। সতর্ক হাওয়ার দল প্রেতচ্ছায়ার মতো নেমে আসে পাহাড়ের খাঁজে। আর সেই শীতল প্রস্তরখণ্ড ঘিরে ক্রমাগত পাক খেতে থাকে। মনে হয় যেন কোনও উপবাসী নারী এক বিন্দু জলের আশায় ক্রমাগত লেহন করে চলেছে শীতল পাথুরে মেঝে।

মানুষটি যে পথ ধরে হেঁটে আসছিল সে পথে একটিও নদী বা প্রস্রবণ নেই। তার সঙ্গে থাকা মশকটি নিঃশেষিত হয়েছে পূর্বদিনেই। যেটুকু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সে পালাতে পেরেছিল তা কবেই উদরসাৎ হয়েছে। অন্ন তার কাছে বোধকরি গতজন্মের স্মৃতি। এই শুষ্ক, ফলহীন, খাদ্যহীন, নির্জলা পথে হেঁটে আসতে আসতে তার মনে হচ্ছিল বুকখানি এবার ফেটে যাবে বোধহয়।

অথচ তাকে যেতেই হবে। যে করেই হোক তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। পৌঁছতে হবে সভ্য সমাজে। মালব, জাবালী, কুরু, অবন্তী, মৎস, সর্বত্র জানাতে হবে কী পাশবিক সন্ত্রাস নেমে এসেছে এই জম্বুদ্বীপের বুকে! নেমে এসেছে এক মূর্তিমান নৃশংস দানবের রূপ ধরে। তার আদিম নৃশংসতার, তার নারকী অত্যাচারের, তার পাশবিক হিংস্রতার অন্ত নেই।

খানিক পথ পেরিয়ে মানুষটি টলতে বসে পড়ল পথের ধারে। পা আর চলে না, শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ দুইদিন ধরে অভুক্ত সে। মশকটিতে একবিন্দু জল অবশিষ্ট নেই।

জম্বুদ্বীপের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে শকাধিপত্যের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল বহুকাল আগে। গান্ধার, পুরুষপুর, পারস্য প্রভৃতি ভূভাগ তাদের অধীনস্থ ছিল। সেই বিজাতীয় শকবংশের একটি শাখা সৌরাষ্ট্র, উত্তর মালব, সিন্ধু থেকে শুরু করে মথুরা এবং উত্তরকুরুর বেশ কিছু পার্বত্য অঞ্চল নিজ অধীনে আনে।

তাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের এক আশ্চর্য উদাসীন সহ্যশক্তি আছে। তাদের চোখের উপর দিয়ে কত শত মহান সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটল। কত শত অত্যুজ্জ্বল রাজবংশের গরিমা পলকে ধুলায় মিলিয়ে গেল। কত বীরত্বের আস্ফালন, কত অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি, কত স্পর্ধার উচ্চারণ, চোখের নিমিষে উধাও হল নিকষ মায়ারাত্রির মধ্যে। কিন্তু ভারতের মানুষের সহজ স্বাভাবিক শান্ত লয়ে বয়ে যাওয়া জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন হল না। তারা লড়তেও যায় না, কাটতেও যায় না, শুধু বসে বসে সবকিছু নির্মোহ চোখে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তারা জানে বিধাতার সবথেকে বড় প্রসাদ—বেঁচে থাকা।

কিন্তু এইবার তাদের শান্ত জীবনতরঙ্গে যে অতি বৃহৎ ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার বুঝি তুলনা নেই।

মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে একবার আকাশের দিকে তাকায়। দেব দিবাকর যেন মহারুদ্ররূপ ধারণ করে এই পৃথিবী সংহারে উদ্যত হয়েছেন। আকাশ জুড়ে চলছে প্রলয়বহ্নির উদ্দণ্ড তাণ্ডব।

চোখ নীচে নামিয়ে নেয় সে। জল নেই? একবিন্দু জল নেই কোথাও? এই তবে শেষ? তার চোখের সামনে তার সন্তানের মুণ্ডচ্ছেদ, তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সম্ভ্রমহানির কোনও প্রতিশোধই নিতে পারবে না সে?

এতক্ষণে তার মৃতদেহ পথের পাশে পড়ে থাকার কথা। কিন্তু সে কোনও সাধারণ মানুষ নয়, কশ্যপমীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সে। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে এই নৃশসংতার কাহিনি পৃথিবীকে জানানোর জন্য।

কিছুটা এগোনোর পর আর পারল না সে। তার চোখের সামনে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল। মৃত মানুষের মতো তার শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মেয়েটি উচ্ছল ঝরনার মতোই হেঁটে আসছিল পাহাড়ি পথ ধরে। তার পায়ে চঞ্চলতা, গলায় গান, মনে উচ্ছ্বাস। সঙ্গীত তার আত্মার বিশ্রাম, অন্তরের আনন্দ।

এই ক্ষুদ্র পার্বত্যগ্রামটির উত্তরদিকে, উপত্যকার পিছনে একটি ক্ষুদ্র প্রস্রবণ আছে। তার জল ভারি সুমিষ্ট। লোকে বলে তার স্বাদ নাকি অমৃততুল্য। সেই প্রস্রবণের একবিন্দু জল মুখে গেলে নাকি মুমূর্ষুও বেঁচে ওঠে, এমনই জাদু তার। অথচ সেখানে কেউ যায় না।

লোকপ্রবাদ, সেখানে নাকি বিষধর সর্পের ভয়ানক উৎপাত। আর তাদের বিষের প্রতিষেধক শ্রেষ্ঠতর ভিষগদেরও অজানা। কিন্তু কোন এক আশ্চর্য উপায়ে সে নিয়তই সেখানে যায়। এবং একা নয়, নিয়ে যায় তার সঙ্গীসাথীদেরও। লোকে বলে সর্প বশীকরণের কোনও গোপনবিদ্যা জানে এই মেয়ে। শুধু সর্প কেন, এই পার্বত্যদেশের পশুপাখিদের বশ করার সমস্ত কৌশল করায়ত্ত তার। সে যখন ওই উপত্যকায় যায়, তখন সেই ভয়ানক সর্পকুল কেন, যাবতীয় হিংস্র পশুরা পর্যন্ত চিত্রার্পিতের মতো তাকে ঘিরে শুয়ে থাকে! যেন এই কিশোরীর পোষ্য তারা।

সেই প্রস্রবণে গিয়ে সে হাতে তুলে নেয় বাঁশি। আর মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের আকাশে বাতাসে ভাসতে থাকে সেই মনকেমনিয়া বাঁশির সুর। সুরের তরঙ্গে থরে থরে কাঁপতে থাকে আকাশের চাঁদ, ঈষৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে গৃহস্থের চুল্লিতে রাখা সফেন দুগ্ধ। শিশুদের নিদুলিসঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায় ঝিমঝিম মায়াজোৎস্নার অমৃতস্রোত। এই ক্ষুদ্র বসতির যুবক-যুবতীদের রক্তে জাগে মাতন।

কাল ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সে ও তার সঙ্গীসাথীরা প্রদীপ আর পায়সান্ন নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের প্রান্তস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে। আজ নাকি সিদ্ধার্থ গৌতম তাদেরই মতো কোনও এক গ্রাম্যবালিকার হাতে প্রস্তুত পায়েস খেয়ে বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন, ভগবান তথাগত হয়ে উঠেছিলেন। সেই থেকে তাদের বসতির সকল কিশোরী-তরুণীর দল বনজোছনার হরিৎ অন্ধকারে পূজা উৎসর্গ করে আসে সেই মহামানবের প্রতি।

গতরাত্রির সেই ভক্তিবিন্দু যেন এই প্রখর বৈশাখী দ্বিপ্রহরেও তার সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সেই আনন্দ, বুদ্ধের চরণে সেই সমর্পণ, সে কি ভোলা যায়?

পথের বাঁক ঘুরেই অবশ্য তার সেই আবেশ নিমেষে অন্তর্হিত হল। পথের মধ্যে শায়িত আছে একটি মনুষ্যশরীর। তার শালপ্রাংশু দেহ ধুলায় ধূসরিত। পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত নগ্নপদদুখানি থেকে রক্তধারা এসে মিশে যাচ্ছে পথধুলায়। শরীরে প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না।

মেয়েটি দৌড়ে গেল সেখানে। মানুষটা বেঁচে আছে তো?

প্রায়ান্ধকার কক্ষটিতে উপস্থিত আছেন দুইজন মানুষ। কক্ষের অন্য প্রান্তে দীপদানে একটি দীপ জ্বলছে। তার আলোয় অন্ধকারে দুইজনের ছায়া দুলছে দেওয়ালের গায়ে। লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, এটি কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের কক্ষ। দেওয়ালে কয়েকজন রাজপুরুষের চিত্র। বাতায়নে দুলছে বহুমূল্য চীনাংশুক। মেঝেটি মহার্ঘ কুতপে আবৃত।

ঘরের মধ্যস্থানে রাখা আছে একটি অনুচ্চ চতুষ্পদী কাষ্ঠাধার। তার ওপর একটি স্বর্ণনির্মিত সুদৃশ্য কলস। আর তার দুইপাশে দু'খানি বহুমূল্য রত্নখচিত ভৃঙ্গার।

কাষ্ঠাধারের দুইপাশে দুইজন মানুষ উপাধান অবলম্বন করে অর্ধশায়িত হয়ে সুগন্ধি তাম্বাকু সেবন করছিলেন। সেই সুমিষ্ট অথচ তীব্র তাম্বাকুধূমে ঘরের বাতাস অস্বচ্ছ ও ভারী হয়ে উঠেছে। আর সেই অস্বচ্ছ নীরবতা ভঙ্গ করে একজন প্রশ্ন করলেন, 'এই তাহলে আপনার পরিকল্পনা, মিত্র?'

প্রশ্নটি যিনি করলেন বোধকরি তিনিই গৃহস্বামী। তাঁর শালপ্রাংশু মহাভুজ শরীরের দিকে দৃকপাতমাত্রে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। প্রশস্ত বক্ষে, বলদৃপ্ত বাহুতে, সুউন্নত স্কন্ধে বিপুল বলের আভাস। বর্ণ গৌর, কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত, গুম্ফখানি সুপুষ্ট, এবং চক্ষুদুটি শীতল ও ক্রূর।

শ্রোতা মানুষটি সামান্য কেশে নিলেন। তিনি বোধকরি এই দেশের অতিথি। কারণ যে পরিমাণ শীতবস্ত্র তিনি অঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি উষ্ণ প্রদেশের মানুষ। বস্তুতপক্ষে এই শুষ্ক ও শীতল পার্বত্য আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না। তিনি বহুবার ভেবেছেন যে কালই প্রভাতে এই পার্বত্য আবাস ছেড়ে নেমে যাবেন সমতলে। চুলোয় যাক তাঁর এতদিনের সাধের পরিকল্পনা। এ অত্যাচার তো আর সহ্য হয় না!

কিন্তু তিনি জানেন যে সে সম্ভব নয়। তাঁর সামনে এখন আর কোনও দ্বিতীয় পথ নেই, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহনায়। যে পথে নেমেছেন সে পথে একবার পা দিলে ফিরবার উপায় থাকে না।

শ্রোতা তাঁর সম্মুখস্থ স্বর্ণভৃঙ্গারটি তুলে চুমুক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক কবোষ্ণ ও কোমল আবেশ তাঁর কণ্ঠদেশ হতে পাকস্থলীর দিকে নামতে লাগল। আহঃ, বড় ভালো, বড় সুন্দর এই দ্রাক্ষা, তৃপ্ত আবেশে চোখ বুজলেন তিনি। স্বার্থ ছাড়া আর দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তিনি বারবার এই পার্বত্য দুর্গে ফিরে ফিরে আসেন, সেটি হচ্ছে পারস্যদেশাগত এই সুগন্ধী দ্রাক্ষারস।

পারস্য এক সুপ্রাচীন মহান দেশ। এই জম্বুদ্বীপের বৈদিক অগ্নি-উপাসকরাই নাকি বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে বসতি স্থাপন করেছিল সেখানে। তদবধি অগ্নি-উপাসনা সে দেশের প্রধান ধর্ম। আর সেই পারস্য দেশের উত্তরার্ধে এক আশ্চর্য জনজাতি বাস করে, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র বাহন ময়ূর যাদের প্রধান উপাস্য। এই কার্তিক জনজাতি নাকি সেই উপত্যকায় এমন এক আশ্চর্য বহুবিচিত্রবর্ণ ফুলের চাষ করে, যার সুগন্ধে বহুদূর পর্যন্ত বসতির পর বসতি আবিষ্ট হয়ে থাকে। সেই সুগন্ধি ফুলের রেণু অত্যুৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসে জারিত হয়ে এমন মধুর সর্বনাশীর রূপ ধারণ করে। তবে বেদনার বিষয় এই যে, কুরুর পূর্বে এই অসামান্য দ্রাক্ষারসটি আনা যায় না, আর্দ্র আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রোতাটি চোখ বন্ধ করে কিছু মৃদু আবেশ উপভোগ করে বললেন, 'এই আপনার সুবর্ণ সুযোগ মহারাজ। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।'

গৃহস্বামী ভ্রুকুঞ্চন করে বললেন, 'আপনি বলছেন গুপ্তসাম্রাজ্য আশু পতনের সম্মুখীন। কারণ গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত মৃত্যুশয্যায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রটি একটি অকালকুষ্মাণ্ড বিশেষ।'

'যথার্থ।'

'তাহলে তো সমুদ্রগুপ্ত ধরাধাম ত্যাগ করা মাত্র আমাদের পাটলিপুত্র আক্রমণ করা উচিত।'

'আজ্ঞে না মহারাজ। ওই দুর্মতি যেন আপনার না হয়। মনে রাখবেন, গুপ্তসেনা এখন অপরাজেয়। রণকৌশলে আর শৌর্যে তাদের সম্মুখীন হওয়া আর পরাজয়কে সাদরে আমন্ত্রণ করে আনা একই ব্যাপার।'

'আপনি কি আমাদের শক্তিসামর্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন মিত্র?' ভ্রুকুঞ্চন করলেন গৃহস্বামী।'

'আজ্ঞে না মহারাজ, অধমের প্রগলভতা মার্জনা করবেন। হতে পারে আপনার সৈন্যবাহিনী শৌর্যবীর্যে মাগধী সেনাদের থেকে কিঞ্চিৎ বেশিই প্রবল। কিন্তু তারা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ, সমতলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত নয়। তদুপরি স্বক্ষেত্রে কুক্কুরীও বাঘিনীবিশেষ। মগধে প্রবেশ করে অজেয় গুপ্তবাহিনীকে পরাস্ত করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব বটে। তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। আর সেইটিই মুখ্য।'

'কী?'

'সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর জ্যেষ্ঠ সন্তানটি অপদার্থ হলে কী হবে, তাঁর মধ্যমপুত্রটি সাহসে শৌর্যে আর বুদ্ধিমত্তায় সম্রাটের যোগ্য উত্তরসূরি। ইতিমধ্যেই রাজ্যশাসনের বিভিন্ন বিষয়ে সম্রাট তাঁর মধ্যমপুত্রটির ওপর নির্ভর

করতে শুরু করেছেন। এমনকী ঘনিষ্ঠদের কাছে এই ইচ্ছেও ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর মধ্যমপুত্র চন্দ্রগুপ্তকেই তিনি গুপ্তসম্রাটের পদে আসীন দেখতে চান। আর তাই যদি হয়...'

গৃহস্বামীর স্বরে হিসহিসিয়ে উঠল হিংস্র রাজরোষ, 'সেই তথ্য জানার জন্য তো আপনার পদদ্বয়ে অপরিমিত স্বর্ণমুদ্রা উৎসর্গ করিনি মিত্র। এই অঘটন কী করে আটকানো যাবে আর কীভাবে পাটলিপুত্র আমার অধীনে আসবে সেই পরিকল্পনাটি জানান।'

শ্রোতা মানুষটি দ্রাক্ষারসে নিজ ভৃঙ্গারটি পূর্ণ করে নিলেন। তারপর বললেন, 'ধীরে মহারাজ, ধীরে। উত্তেজনা মানুষের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে। আপনাকে হতাশার বাণী শোনাব বলে তো এখানে আসিনি। আর আপনার স্বার্থপূরণের সঙ্গে আমার স্বার্থসিদ্ধিও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা বিস্মরণ হননি আশা করি। এবার শান্ত হয়ে আমার পরিকল্পনাটি শুনুন।

গুপ্তরাজবংশের একটি প্রথা আছে। সচরাচর সম্রাটের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজত্বের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু এই নিয়মের একটি ব্যত্যয় আছে। সম্রাট চাইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত নিজের মনোনীত অন্য কাউকে পরবর্তী সম্রাটরূপে নির্বাচিত করে যেতে পারেন। কিন্তু সেই নির্বাচন তখনই বৈধ হবে যখন সম্রাট নিজে বরিষ্ঠ সভাসদদের সামনে সেই নির্বাচিত ভাগ্যবানের হাতে নিজের রাজমুকুটটি তুলে দেবেন। যদি কোনও কারণে তা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথানুযায়ী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হবেন।'

গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ ভ্রুকুটি কুটিল চোখে বক্তব্যটি প্রণিধান করলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বক্তব্যের মধ্যে কিছু গূঢ়ার্থের সন্ধান পাচ্ছি মিত্র। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন কি?'

শ্রোতা এবার একটু উঠে বসলেন। ভৃঙ্গারটি হাতে ধরে বললেন, 'রাজবৈদ্য আমার ঘনিষ্ঠ স্বজন। তিনি জনান্তিকে আমাকে জানিয়েছেন যে সম্রাটের আয়ু বড়জোর আর দুই মাস মাত্র। এই দুই মাস যদি কোনওগতিকে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্র হতে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, তাহলেই পরিকল্পনার প্রথমার্ধ সফল। কুমার চন্দ্রগুপ্তর অনুপস্থিতিতে সম্রাট পরলোকগমন করলে প্রথানুযায়ী কুমার রামগুপ্তই সম্রাট হবেন। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগ বাস্তবায়িত করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে।'

'আর চন্দ্রগুপ্তকে কোন কূটকৌশল দ্বিমাসাধিককাল পাটলিপুত্র হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন শুনি?'

'উপায় আছে সম্রাট। একটিই উপায় আছে। মন দিয়ে শুনুন।

মালবের ওপর আপনার লক্ষ্য বহুদিনের। এই মালব এককালে গুপ্তদের করদ রাজ্য ছিল। ক্রমে দুই রাজবংশের মধ্যে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি এবং সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত একই গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁদের বাল্যবন্ধুত্ব ক্রমে গভীর রূপ ধারণ করে। সেই বন্ধুত্ব অদ্যাবধি অটুট। এমনকী চন্দ্রজ্যোতি বিবাহও করেন সমুদ্রগুপ্তর এক অতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়া চন্দ্রলেখাকে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ভগিনীর বিবাহের যৌতুকরূপে মালবদেশকে করমুক্ত রাজ্য ঘোষণা করেন। তাতে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও বর্ধিত হয়। সম্রাট যতবার উজ্জয়িনীতে অবসর বিনোদনে গেছেন, ততবার মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি সম্রাটের প্রিয় বয়স্যরূপে আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন। সেই অবসর বিনোদন ছিল দুই সমবয়সি সহপাঠীর বয়সকালের স্মৃতিমন্থন।

আপনি মালব আক্রমণের বার্তা পাঠান। বর্তমানে আপনার সৈন্যবাহিনীকে যদি কেউ প্রতিহত করতে পারে সে হল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর অধীন গুপ্তসেনানী। মালবের এই দুর্দিনে সম্রাট চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না। তিনি নিজে না এলেও, অবশ্যই কুমার চন্দ্রগুপ্তকে পাঠাবেন। আপনার উদ্দেশ্য হবে আক্রমণের উদ্যোগ, অভিনয় ইত্যাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে মালবে ব্যস্ত রাখা। ইত্যবসরে সম্রাট পরলোকগমন করলে কুমার রামগুপ্তই হবেন পরবর্তী সম্রাট।'

'বুঝলাম। কিন্তু তার পর? পাটলিপুত্র আমার অধিকারে আসবে কী করে সেইটি বলুন।'

অতিথি মহোদয় খুক খুক করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'সেইটি পরে জানাব মহারাজ। কারণ সেটি বাস্তবায়িত করতে গেলে চতুরঙ্গের অন্য অনেক অঙ্গ ব্যবস্থাপিত করতে হবে। তার জন্য সময় প্রয়োজন। সময় হলেই আপনার কাছে দূত প্রেরিত হবে।'

গৃহস্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি জানতেন যে এই উত্তরই পাবেন। এই ব্রাহ্মণবটুর ধূর্ততা তুলনাহীন। ইনি কখনই নিজের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন না। তিনি চান এই ক্রীড়ার সমস্ত সূত্রগুলি নিজের কুক্ষিগত করে রাখতে, যাতে ক্রীড়নকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই থাকে।

'উত্তম, আপনার কথাই থাক তাহলে। তবে এইবার আমার একটি শর্ত আছে।'

'বলুন মহারাজ।'

'আশঙ্কা করছি যে রামগুপ্তর সিংহাসনারোহন খুব একটা নির্বিঘ্ন হবে না। নির্বিঘ্ন হওয়ার কথাও নয়। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সভাসদদের একাংশ চন্দ্রগুপ্তর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। চাণক্য বলেন এমত পরিস্থিতিতে রাজন্য ও রাজসভাসদরা ক্রুদ্ধবর্গ, ভীতবর্গ, লুব্ধবর্গ এবং মানীবর্গ—এই চার বর্গে বিভাজিত হন।'

'আপনার বক্তব্য যথাযথ, রাজন।'

'আমার কাছে সংবাদ আছে যে পাটলিপুত্রের সমাহর্তা দিবোদাস ক্রমেই কুমার চন্দ্রগুপ্তর বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন। তিনি বোধকরি ক্রুদ্ধবর্গেই পড়বেন। তদুপরি পাটলিপুত্রের গুপ্তচরদের প্রসিদ্ধি প্রবাদপ্রতিম। তাদের কপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহক, প্রতিটি বিভাগই সুনিপুণ এবং সুসংহত। আমার আশঙ্কা এই হট্টগোলের সময়ে প্রতিটি ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ তাঁদের অনুরক্ত গুপ্তবাহিনীকে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার কার্যে নিয়োজিত করবেন।'

অতিথি মৃদু হাসলেন। এই না হলে এত বড় সাম্রাজ্যের রাজন। আগত পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করেছেন গৃহস্বামী।

'ফলে আমি এমত অবস্থায় আপনার ঘনিষ্ঠ গুপ্তপুরুষদের ওপর ভরসা করতে পারছি না। কে কখন উভয়বেতনচারী হয়ে পড়বে তার কী নিশ্চয়তা?'

মাথা নাড়লেন অতিথি। কথাটা মিথ্যা নয়।

'তাই আমি আপনার গূঢ়লেখ আমার কাছে আনানোর জন্য নিজস্ব দূতের ব্যবস্থা করেছি। আপনি শুধুমাত্র তার মাধ্যমেই আপনার পরবর্তী সংবাদ প্রেরণ করবেন।'

অথিতির ভ্রু কুঞ্চিত হল। তিনি বললেন, 'কে সেই দূত?'

গৃহস্বামী স্বর উঁচু করে কাকে যেন আদেশ দিলেন। একটু পরেই একটি অদ্ভুতদর্শন মানুষ এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

অতিথি দেখলেন আগন্তুকের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, আকৃতিতে বামন, মস্তকটি অস্বাভাবিক বৃহৎ এবং দর্শনীয় হচ্ছে তার কেশরাজি। মনে হয় কে যেন পুঞ্জীভূত মেঘরাশি তার মাথায় কুঞ্চিত কেশদামরূপে সাজিয়ে দিয়েছে।

গৃহস্বামী বললেন, 'আমি একে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি মিত্র। একে পাটলিপুত্র নিয়ে যান। বলবেন তীর্থ করতে এসে একে ক্রয় করেছেন।'

অতিথি সামান্য বিরসবদনে আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন, 'কী নাম তোমার?'

আগন্তুকের হয়ে গৃহস্বামী উত্তর দিলেন, 'ও জন্মাবধি মূক, মিত্র। মূক ও বধির। ওর কোনও নাম নেই, কারণ ওর নামের কোনও প্রয়োজন নেই।'

কিশোরটি একগাল হাসল। অতিথি দেখলেন তার মুখগহ্বর সম্পূর্ণরূপে দন্তহীন!

অতিথি আশ্চর্য হলেন, 'এই মূক ও বধির বটুর ওপর আপনি এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করতে চলেছেন?'

'তার কারণ আছে মিত্র।

তুমি তো জানো কয়েক বৎসর পূর্বে আমি শাকল জয় করি। আমার সৈন্যবাহিনী অন্য অনেকের সঙ্গে একেও তুলে এনেছিল দাসরূপে বিক্রয়ের জন্য। পরে দেখা যায় এই কিশোর মূক ও বধির, তাকে কেউ ক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়নি। বালকটি অনাহারে মারাই যেত, যদি না আমার এক উপপত্নী দয়াপরবশ হয়ে একে স্থান দিতেন।

পরে দেখা যায় বালকটির কয়েকটি গুণ আছে। এ অতিশয় বাধ্য এবং প্রভুভক্ত। প্রয়োজন হলে প্রাণত্যাগ করবে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ছুরিকাচালনে অতিশয় দক্ষ, দ্রুত স্থানপরিবর্তনে পটু, অনাহারে বহুদিন প্রাণধারণ করতে পারে, এবং অকুস্থল থেকে দ্রুত অদৃশ্য হতে এর জুড়ি নেই।'

'কিশোরের গূঢ়কর্মের পারদর্শিতা সম্যকরূপে প্রণিধান হল মহারাজ। কিন্তু এই অতীব গম্ভীর গুরুদায়িত্ব একে অর্পণের কোনও বিশেষ কারণ?'

'কারণ আছে মিত্র।

এই কিশোরের একটি বিশেষত্ব আছে। এর কেশরাজি অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বর্ধিত হয়। বস্তুত পক্ষে প্রায় প্রতি পক্ষকালেই এর কেশকর্তনের প্রয়োজন হয়। কারণ সম্পূর্ণ মুণ্ডিত মস্তক থেকে এই ঘনকেশী অবস্থায় আসতে এই কিশোরের ঠিক এক পক্ষকাল প্রয়োজন হয়।'

অতিথি সপ্রশ্ন চোখে গৃহস্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

'আপনি একে নিয়ে যান মিত্র। আপনার পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগ আপনি এর মাধ্যমেই আমাকে প্রেরণ করবেন; এবং স্বহস্তে।'

আশ্চর্য হওয়ার চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন অতিথি। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু...কীভাবে?'

গৃহস্বামী অত্যন্ত নীচু স্বরে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। শুনতে শুনতে অতিথির মুখে হাসি ফুটে উঠল।'

দত্তাদেবী কঠিনস্বরে বললেন, 'সনাতন ভারতের স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম হল সম্রাটের প্রয়াণ হলে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনে আসীন হবেন। আমি বেঁচে থাকতে সেই নিয়মের ব্যত্যয় হতে দিতে পারি না। তাতে সম্রাটের ইচ্ছাপূরণ না হলে না হবে।'

দত্তাদেবী গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহিষী, মহাদেবী। কিশোরীকালে যখন পিতৃগৃহ হতে সমুদ্রগুপ্তর ঘরনি হতে আসেন, তখন তিনি ষোড়শবর্ষীয়া। ক্রমে সমুদ্রগুপ্ত এই সসাগরা জম্বুদ্বীপের অপরাজেয় সম্রাট হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে দত্তাদেবীও ভীরু কিশোরীর খোলস ছেড়ে হয়ে উঠলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপী পট্টমহিষী। সমুদ্রগুপ্ত সহজ মানুষ নন। তাঁর ক্ষাত্রতেজ কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। তাঁর ক্রোধদীপ্তি প্রজ্জ্বলিত হলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মুখ্য সভাসদরাও ভীত হতেন। সেই অবস্থায় একমাত্র পট্টমহিষী দত্তাদেবীই পারতেন তাঁর রুদ্ররূপের সম্মুখীন হতে।

সম্রাটের সেই দাপট আর নেই। কিন্তু সিংহ না থাকলে কী হবে, সিংহিকা আছেন। কাঠিন্যে, ক্রূরবুদ্ধিতে, এবং প্রভাবে দত্তাদেবী সম্রাটের থেকে কোনও অংশে কম নন।

আজকের মন্ত্রণাসভা বসেছিল দত্তাদেবীর প্রাসাদের একটি অংশে। মহাদেবী যাবতীয় গুপ্ত আলোচনা এখানেই করে থাকেন।

এই মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত আছেন কয়েকজন বাছাই করা মানুষ। এঁরা প্রত্যেকেই দত্তাদেবীর অত্যন্ত কাছের, এবং তাঁর আনুগত্যের মানদণ্ডে সসম্মানে উত্তীর্ণ।

প্রথমজন বয়সে তরুণ। তিনি উক্তি করলেন, 'কিন্তু মহাদেবী, সম্রাট যদি ইচ্ছা করেন যে সনাতন প্রথা ভঙ্গ করবেন, স্মৃতিশাস্ত্র অতিক্রম করবেন, সে অধিকার তাঁর আছে।'

দ্বিতীয়জন বয়সে প্রৌঢ়, তিনি মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করলেন, 'সম্রাট স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভূ। তিনি শাস্ত্রেরও অগ্রবর্তী। তাঁর ইচ্ছাই নিয়ম, তাঁর ইচ্ছাই বিধান।'

দত্তাদেবী রুষ্ট হলেন। 'কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যদি সাম্রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের পরিপন্থী হয়? সমাজস্থিতি বিনষ্ট করে?'

তৃতীয়জন বলশালী পুরুষ। দেখে যুদ্ধজীবী বলে মনে হয়। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'তবুও সম্রাটের ইচ্ছাই শেষ কথা মহাদেবী। তিনিই রাষ্ট্র, তিনিই ঈশ্বর। তাঁর অভিপ্রায় দেবতার অভিপ্রায়।'

দত্তাদেবী ক্ষুব্ধ মুখে বসে রইলেন।

প্রৌঢ় বললেন, 'আপনার মনোবাসনা ব্যক্ত করুন মহাদেবী।'

দত্তাদেবী বললেন, 'সম্রাটের মনোবাঞ্ছা কুমার চন্দ্রগুপ্তর হাতে গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সমর্পণ করা। কিন্তু আমার মতে জ্যেষ্ঠ সন্তান রামগুপ্তই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

উপস্থিত তিনজন চুপ করে রইলেন। তাঁরা এই প্রস্তাবের অযাথার্থ্যতা জানেন। কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাদেবীকে সে কথা বোঝায় কে?

রামগুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর জ্যেষ্ঠ সন্তান। শিশুকাল হতেই তিনি মাতা দত্তাদেবীর নয়নের মণি। গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহিষী তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তানের উপর। বোধকরি সেই জন্যই রামগুপ্ত ক্রমশ অলস, বিলাসী, কুটিল এবং দুশ্চরিত্র হয়ে উঠলেন। দিনের অধিকাংশ সময় সুরা এবং অন্যান্য বিলাসব্যসনে কাটে। তদুপরি তিনি স্বভাবে নিষ্ঠুর ও ক্রূর। গুরুজনদের উপহাস, মানীকে অসম্মান করে প্রভূত আনন্দ পান। রামগুপ্তকে পছন্দ করেন এমন পারিষদ রাজসভায় কমই আছেন।

কুমার চন্দ্রগুপ্ত সম্রাটের দ্বিতীয় সন্তান। স্বভাবে তিনি রামগুপ্তর সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতার মতোই রণকুশল এবং কূটনীতিজ্ঞ। সাহসী, কুশলী, বীর এবং স্বভাবে নম্র এই কুমার পারিষদবর্গের অধিকাংশেরই প্রিয়পাত্র। ইনি সুশিক্ষিত, সুবিনয়ী এবং সুধীর।

কিন্তু মানুষের স্নেহের গতি অতি বিচিত্র। কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রবল চরিত্রের মাতৃদেবীরা নিজেদের দুর্বল এবং অপদার্থ পুত্রদের প্রতি কিঞ্চিৎ অহৈতুকী স্নেহ পোষণ করে থাকেন। খুব সম্ভবত নিজের চরিত্রের দার্ঢ্য এবং প্রাবল্য দিয়ে অক্ষম পুত্রের অপদার্থতার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চান। দেখা গেল দত্তাদেবী ক্রমেই তাঁর অযোগ্য এবং অপদার্থ পুত্রটিকে নিজের শাসন-অঞ্চলের নীচে আশ্রয় দিতে শুরু করেছেন। আর ব্যক্তিত্ববান চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে ক্রমেই তাঁর দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। দত্তাদেবী সার্বিক, নিঃসংশয়, সাষ্টাঙ্গ আনুগত্য ছাড়া কিছু বোঝেন না। চন্দ্রগুপ্ত বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, এবং স্পষ্টবক্তা। উচিত বুঝলে তিনি সম্রাটের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও ছাড়েন না।

উপস্থিত সভ্যরা বুঝলেন, দত্তাদেবী চান সম্রাটের অবর্তমানে তিনিই গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হবেন। সেই জন্যই পাটলিপুত্রর সিংহাসনে তিনি রামগুপ্তকে চান, যাঁকে তিনি ইচ্ছেমতো চালনা করতে পারবেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি কারও ছায়ায় থেকে রাজ্যশাসন করার মানুষ নন। তাই সনাতন অনুশাসন তথা সমাজ সংস্থিতির প্রতি মহাদেবীর এই অকস্মাৎ অনুরাগ।

তরুণ বললেন, 'গুপ্তবংশের নীতি আমাদের চেয়ে আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন দেবী। সাধারণ পরিস্থিতিতে কুমার রামগুপ্তই পরবর্তী সম্রাট হবেন। এই নিয়মের একটিই ব্যত্যয় সম্ভব। সম্রাট যদি পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে রাজমুকুট কুমার চন্দ্রগুপ্তর হাতে তুলে দেন, একমাত্র সেক্ষেত্রেই গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার মধ্যমকুমারের উপর বর্তাবে। অতএব আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার একটিই বৈধ উপায় আছে।

রাজবৈদ্য জানিয়েছেন সম্রাটের আয়ু আর দুই মাস মাত্র। যদি এই দুই মাস কুমার চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্র হতে দূরে রাখা যায়, তাহলে কোনও বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন না করেই আপনার অভিপ্রায় পূরণ হতে পারে।'

দত্তাদেবী ভ্রুকুঞ্চন করলেন, 'কিন্তু সে সম্ভব হবে কী উপায়ে?'

এবার মুখ খুললেন প্রৌঢ়, 'উপায় আছে মহাদেবী। আমার কাছে সংবাদ আছে যে শকরাজ রুদ্রসিংহ শীঘ্রই মালব আক্রমণে উদ্যোগী হবেন। বর্তমানে রুদ্রসিংহের সেনানী এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধৃবর্গে পরিণত হয়েছে। মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতির ক্ষমতা নেই সেই আক্রমণ প্রতিহত করার।

আমাদের গুপ্তচরদের মুখে সংবাদ পেয়েছি যে আর দুই দিনের মধ্যেই মালবরাজের দূত পাটলিপুত্র এসে পৌঁছবে। মালবরাজ গুপ্তসাম্রাজ্যের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। আমাদের উচিত হবে মালবরাজের সাহায্যার্থে কুমার চন্দ্রগুপ্তর অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী আশু প্রেরণ করা।'

দত্তাদেবী ইঙ্গিত বুঝলেন। প্রশ্ন করলেন, 'আর সম্রাট যদি সম্মত না হন?'

যুদ্ধজীবী সামান্য হেসে বললেন, 'তাকে সম্মত করাবার জন্য মহাদেবী স্বয়ং তো রইলেনই।'

তরুণ বললেন, 'প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখুন মহাদেবী। এর থেকে উত্তম সুযোগ আর পাবেন না। এই যুদ্ধের দুটি ফলাফল হতে পারে। যে করে হোক যুদ্ধ মাসাধিক কাল চলবেই। কুমার চন্দ্রগুপ্ত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তবুও তাঁর রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সম্রাট পরলোকগমন করবেন। আর যদি পরাস্ত হন, তাহলেও তাই। তদুপরি তিনি ফিরবেন পরাজয়ের কলঙ্কটীকা সহ। সব দিক দিয়েই কুমার রামগুপ্তর সম্রাটভাগ্য একেবারে নিশ্চিন্ত।'

এতক্ষণে দত্তাদেবীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি প্রীতস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কবে পৌঁছচ্ছে মালবরাজের দূত?'

মালবরাজসিংহাসনে বসে আছেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি। বয়সে প্রৌঢ় হলে কী হবে, শক্তিতে, রণকৌশলে এবং বীর্যবত্তায় তাঁর সমকক্ষ পুরুষ মালবদেশে কমই আছে। বীরত্বে, প্রজানুরঞ্জনে, পাণ্ডিত্যে তিনি আপামর মালবজনের কাছে পিতৃস্বরূপ।

আজ সেই মালবরাজ মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক তরুণ কুমার। দেহকান্তিতে, স্বাস্থ্যে, ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে তাঁকেই সবার আগে চোখে পড়ে। তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি, তাঁর মুখখানি কৌতুকগম্ভীর, চোখের তারায় সস্নেহ প্রশ্রয়দীপ্তি।

কুমার বোধহয় কোনও কারণে উত্তেজিত। কারণ একটু পরেই তিনি মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির সামনে ক্রুদ্ধ এবং উদ্ধতস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি গুপ্তবংশের যুবরাজের সামরিক যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন মহারাজ? মনে রাখবেন, আমি রাজাধিরাজ শ্রীগুপ্তর উত্তরাধিকারী, রাজসূয় যজ্ঞাধিকারী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বংশধর। আপনার দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে সম্রাট নিজে আমাকে পাঠিয়েছেন বর্বর শকজাতির আক্রমণ থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য। আর আপনি প্রশ্ন করছেন আমি বা আমার ভ্রাতা এই কাজে সমর্থ হব কিনা?'

চন্দ্রজ্যোতি মৃদু হাসলেন। সেই হাসির মধ্যে অনেকখানি স্বস্তি আর বাৎসল্যও মিশে ছিল কি?

মালবাধিপতি চন্দ্রজ্যোতি শুধু একজন প্রজানুরঞ্জক রাজাই নন, একজন বীরযোদ্ধাও বটে। বহুকাল ধরে স্বীয় বলবীর্যে মধ্যভারতের এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসন করেছেন। শত্রুদের পরাস্ত করেছেন বারে বারে। কদাচ বিজিত পক্ষের মর্যাদার হানি করেননি। ক্রমে একদা যারা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল তারাও তাঁর স্নেহের শাসনে

বশীভূত হয়েছে। পরাজিতপক্ষে কোনও গুণী মানুষের সন্ধান পেলে তাঁকে সম্মানসহ মালবরাজসভায় উচ্চপদে আসীন করেছেন।

কেবলমাত্র একটি শত্রুপক্ষ বাদে। শকজাতি।

শকজাতির ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু জানা যায় নগাধিরাজ হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে, পারস্যদেশের উত্তরার্ধের কোনও ঘন বনানীঘেরা মহাকায় এক হ্রদের তীরে তাদের বাস ছিল একদা। এরা দুর্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় জাতি। এরা অশ্বারোহণে অসম্ভব পটু, ধনুর্বিদ্যায় অতিশয় ক্ষিপ্র এবং ক্রূরতায় তুলনাহীন। প্রায় অর্ধসহস্রাব্দ যাবৎ তারা জম্বুদ্বীপের উত্তর পশ্চিমার্ধ শাসন করছে। তাদের সঙ্গে মালবদের শত্রুতাও প্রায় শতাধিক বৎসরের অধিক হবে। চন্দ্রজ্যোতি নিজেও বয়ঃপ্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শকদমনে রত হয়েছেন। এবং স্বীয় পরাক্রম সামর্থ্যে চিরশত্রু শকদের পরাস্ত করেছেন বারে বারে, ব্যর্থ হননি কখনও। শুধু এইবার, এইবার তাঁর মনে হয়েছে যে আর বোধহয় শক্তি সামর্থ্যে তিনি শকদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না।

তার প্রধান কারণ—শকাধিরাজ রুদ্রসিংহ!

রুদ্রসিংহের পিতা ছিলেন শকাধিপতি সত্যসিংহ। শকজাতি রণোন্মাদ যোদ্ধজাতি, এবং সত্যসিংহ সেই রক্তলোলুপ জাতির সার্থক নৃপতি ছিলেন। ধনুর্বিদ্যা এবং তরবারিচালনে তাঁর সমকক্ষ বীর ভারতবর্ষে কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তিনি বীর হলে কী হবে, নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং ধূর্ত অন্যায়যুদ্ধ তাঁর বীরত্বের কলঙ্কভূষণ ছিল।

ভারতবর্ষ চিরকালই ন্যায়যুদ্ধে এবং ধর্মযুদ্ধে বিশ্বাসী। বিশ্রামরত শত্রুশিবিরে আক্রমণ, স্ত্রী এবং শিশুদের ওপর নির্যাতন, নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, এসব ভারতের যুদ্ধশাস্ত্রে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। বিজিত ভারত শরণাগত হলে বিজয়ী ভারত তাকে অভয়দান করেছে। নারীজাতির সম্মানরক্ষা করেছে, শিশুদের নিজক্রোড়ে স্থান দিয়েছে।

কিন্তু শকজাতি যবন জনজাতি। ভারতীয় যুদ্ধনীতি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পরাজিত শত্রুদের প্রতি তাদের নৃশংতা ভয়াবহ। তাদের রণনীতি মারি অরি পারি যে কৌশল। নির্জিত শত্রুদের সামূহিক উৎসাদন তাদের প্রধানতম বিলাস, প্রিয়তম ব্যসন। আর সেই বিলাসব্যসনের জন্য ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও তারা পশ্চাৎপদ হয়নি কখনও।

আর সত্যসিংহ এই অপরিসীম নিষ্ঠুরতার সার্থক প্রতিভূ ছিলেন। অকস্মাৎ আক্রমণে শত্রুপক্ষের জনপদকে নির্মূলীকরণ, অগ্নিসংযোগে ফলবতী শস্যভূমির ধ্বংসসাধন, নিরীহ নিরপরাধ গ্রামবাসীর গণউৎসাদন এসবে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। শত্রুপক্ষের রক্তদর্শনে তিনি প্রীত হতেন, শত্রুর হাহাকার শ্রবণে উত্তুঙ্গ আনন্দবোধ করতেন।

রুদ্রসিংহ তাঁর পিতার অপরিসীম নৃশংসতার উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর চরিত্রের এক ঘনঘোর তমসাচ্ছন্ন দিক। তাঁর অপরিসীম, অবিরাম, অনিঃশেষ নারীলিপ্সা!

নারীসম্ভোগের ব্যাপারে রুদ্রসিংহের কুখ্যাতি প্রবাদপ্রতিম। যৌবনোন্মেষ কাল থেকেই তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধপুরুষ। শকরাজ্যে কথিত আছে, যদি কোনও সুন্দরী নারীর উপর কোনও প্রকারে রুদ্রসিংহের অনুরাগ জন্মায়, তাহলে যেনতেনপ্রকারেণ সেই হতভাগিনীকে অঙ্কশায়িনী না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

আর এই বিষয়ে তিনি প্রকৃতই সাম্যপন্থী। ঘনিষ্ঠ মিত্রের স্ত্রী অথবা কন্যা থেকে শুরু করে নিজ স্ত্রী-কন্যার প্রিয়তম সখী, সবাইকেই সমান চক্ষে দেখেন। তাঁর বৈধ পত্নীর সংখ্যা একাদশ, অবৈধ রক্ষিতা এবং যৌনদাসীদের সংখ্যা অগণিত। যুদ্ধের পর বিজিত জাতির নারীদের প্রকাশ্য গণলাঞ্ছনা তাঁর একান্ত চিত্তবিনোদন। প্রিয়বিয়োগে কাতর নারীদের সামূহিক যৌনসম্ভোগ তাঁর প্রিয়তম ক্রীড়া। আর নিজের যৌনক্ষুধা তৃপ্ত হলে সেই হতভাগিনীদের তিনি বণ্টন করে দেন শকসৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে, যেভাবে লোলুপ তরক্ষুদের সামনে নিক্ষিপ্ত করা হয় হরিণীমাংসপিণ্ড।

আর বিজিত রাজ্যের হতভাগ্য নৃপতির পত্নী ও কন্যারা?

তাঁদের তিনি পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে উপভোগ করেন মাসাধিককাল ধরে। বিজিত জাতির অভিজাত নারীদের সঙ্গে তুচ্ছ বারাঙ্গনাতুল্য ব্যবহার করা, তাদের প্রকাশ্যে সামূহিক গোষ্ঠীসম্ভোগ রুদ্রসিংহের অতি প্রিয়তম যৌনক্রীড়া। তারপর সেই হতভাগিনীদের ঠাঁই হয় উচ্চপদাধিকারীদের যৌনদাসীদের মধ্যে। রুদ্রসিংহের স্পষ্ট নির্দেশ, পরাজিত জনজাতির নারীদের গর্ভ অধিকার করে সেই গর্ভে সবল সক্ষম শকপুরুষদের বীজ বপন করতে হবে। বিজিত জাতির নারীদের ধর্ষণ এবং সবলসম্ভোগে তাঁর পূর্ণ অনুমোদন তথা সোৎসাহ সমর্থন আছে।

পশ্চিম এবং উত্তর জম্বুদ্বীপ এখন রুদ্রসিংহের পদানত। তদঞ্চলের বিজিত জাতিসমূহের লাঞ্ছনার সংবাদ অতি সাহসী মানুষের মনেও ভীতিসঞ্চার করে। পুরুষরা শ্রবণমাত্রে ভীত ও ক্রুদ্ধ হন। নারীরা আতঙ্কিত হয়ে শ্রীবিষ্ণুর নাম জপতে থাকেন। নারীত্বের এমন চরম লাঞ্ছনা যেন তাঁদের সঙ্গে মরণেও না হয়।

চন্দ্রজ্যোতি যখন চরমুখে সংবাদ পেলেন যে রুদ্রসিংহ এবার মালব আক্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছেন, স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। এ রাজ্যের প্রজাদের তিনি সন্তানসম জ্ঞান করেন। তাঁদের ওই অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে দিতে তিনি পারেন না। তাঁর পিতা-পিতামহের স্মৃতিবিজড়িত এই রাজ্যের পথে-ঘাটে-শ্মশানে নৃত্য করবে ওই নারকী পাপিষ্ঠের দল? ছারেখারে যাবে তাঁর জন্মভূমি? তাঁর শরীরে একবিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকতে তা কখনই নয়।

তবে শুধু নিজের প্রজাবর্গের রক্ষাসাধন নয়, তাঁর আরও একটি চিন্তার কারণ ছিল। আর সেই কারণ তাঁর স্নেহপুতলি, দুচোখের মণি, রাজকন্যা ধ্রুবা।

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি যৌবনকাল হতে বিপত্নীক। রাজ্ঞী চন্দ্রলেখা কন্যার জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন। সেই থেকে মাতৃহীনা অভাগী কন্যাটিকে একাধারে পিতা এবং মাতা হয়ে লালন করেছেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি। বহু অনুরোধেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। শুধু তাই নয়, দাসী বা রক্ষিতা সম্ভোগেও তাঁর কোনওদিনই রুচি ছিল না। শুদ্ধচিত্ত মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির একমাত্র ধ্যানজ্ঞানচিন্তা ছিল কন্যা ধ্রুবার সার্বিক পালনপোষণ।

তাই তিনি রুদ্রসিংহের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ামাত্র দ্বিধা করেননি। দূত পাঠিয়েছিলেন পাটলিপুত্রে, বাল্যবন্ধু এবং মহাপরাক্রান্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর কাছে। প্রাণাধিকা প্রিয়া কন্যাকে শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হতে দিতে তিনি পারবেন না। তার জন্য বাল্যবন্ধুর সাহায্যপ্রার্থী হতেও তাঁর আপত্তি নেই।

তিনি জানতেন যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এখন মৃত্যুশয্যায়। যে বলদর্পী সিংহ একক ক্ষমতায় প্রায় অর্ধেক জম্বুদ্বীপ নিজ অধিগত করেছেন, তিনি দুরারোগ্য কর্কটব্যাধিতে আক্রান্ত। সসাগরা জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যরা ব্যর্থ হয়েছেন সম্রাটকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে। বহু বিচিত্রতর ঔষধ, দেশের দুর্গম অঞ্চল হতে আনা জাদুরসায়ন, বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়া, কিছুই কাজে আসেনি। সম্রাট অবশেষে নিরস্ত করেছেন তাঁর রাজপরিষদবর্গকে। জীবনের শেষ ক'টা দিন তিনি শান্তিতে কাটাতে চান। ব্যথাজর্জর দেহের ক্লেশ তিনি শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করেছেন।

তবে বাল্যবন্ধুকে তিনি নিরাশ করেননি। তাঁর অজেয় সেনানীর একটি ক্ষুদ্র অথচ দুর্ধর্ষ রণকুশল অংশকে তৎক্ষণাৎ মালবের উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন তিনি। আর তার সৈনাপত্যের ভার দিয়েছেন নিজের যোগ্যতম আত্মজকে, মধ্যমকুমার চন্দ্রগুপ্তকে।

'যাও পুত্র। মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি আমার বাল্যবন্ধু শুধু নয়, বৈবাহিক সূত্রে আমাদের আত্মীয়ও বটে। তার ওপর তার মতো আত্মাভিমানী এবং স্বীয় বলবীর্যে আস্থাশীল মানুষ আমি কমই দেখেছি। সে যখন আমার

সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, তখন কিছু গুরুতর কারণ ঘটেছে বই কী। দ্রুত মালবদেশে যাও এবং তার বিপদ দূরীভূত করো। আর শোনো, তার মতো স্থিরবুদ্ধি, প্রজাপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ মেলা ভার। তাঁকে পিতৃতুল্য জ্ঞান কোরো, আর সেই প্রাজ্ঞ মানুষটির কাছে জীবন ও রাজনীতির পাঠ নিও।'

কুমারের চলে যাওয়ার পথে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন সম্রাট। শেষবার যখন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, তার সঙ্গে তার দশমবর্ষীয়া কন্যাটিও ছিল। ভারি লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর কোনও কন্যা নেই। মেয়েটিকে দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় ভারি প্রসন্ন এবং তৃপ্ত হয়েছিল।

চোখ বোজেন সম্রাট। এখন কত বয়েস হবে মেয়েটির? কুমার চন্দ্রগুপ্তর থেকে কয়েক বছর কমই হবে।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে যায় মহাপরাক্রমশালী, বিক্রমকেশরী, জম্বুদীপাধিপতি রাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তর। কবে ফিরবে মধ্যমকুমার?

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি অতি সমাদরে বরণ করেছিলেন কুমার চন্দ্রগুপ্তকে। শুধু চন্দ্রগুপ্ত নন, বরণ করেছিলেন কুমারের ছায়াসঙ্গী কুমার কচগুপ্তকেও।

কুমার কচগুপ্ত সম্পর্কে কুমার চন্দ্রগুপ্তর পিতৃব্যপুত্র। জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি জ্যেষ্ঠ ব্যতীত আর কাউকে চেনেন না। বয়সে কিশোর এই কুমার প্রকৃতার্থেই কুমার চন্দ্রগুপ্তর দ্বিতীয় ছায়া। কুমার চন্দ্রগুপ্ত'ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখেন। গুপ্তমহিষীরা প্রীতস্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আর রামানুজ লক্ষ্মণ গুপ্তবংশে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছেন।

কিশোর কচকে দেখে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির অন্তরে বোধকরি কিঞ্চিৎ স্নেহমিশ্রিত কৌতুকের উদ্ভব হয়ে থাকে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কুমার এই যুদ্ধের জন্য শরীরে, মনে এবং সামরিকভাবে প্রস্তুত তো?'

শোনা মাত্র জ্যা-মুক্ত ধনুর মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। প্রশ্ন করেছিলেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি কি তাঁদের সামরিক যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

তরুণ ভাস্করের মতো উজ্জ্বল কন্দর্পকান্তি সেই যুবক, যাঁর দুচোখে দীপ্তিময় অহংকার ঝলসে উঠছে হীরকচূর্ণের মতো, তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি। শান্ত অথচ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আপনার বা কুমার কচগুপ্তর যুদ্ধক্ষমতার প্রতি কোনও সন্দেহ পোষণ করি না কুমার। শুধু কুমার কচগুপ্তর তরুণ বয়স দেখে সামান্য চিন্তায় ছিলাম। তবে সেই চিন্তা দূর হয়েছে। আপনি আপাতত বিশ্রাম করুন। যথাসময়ে আমাদের আমার দেখা হবে।'

মালবের আকাশ রাত্রিকালে বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর। দিবাভাগ অসহনীয় হলে কী হবে, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মধুর বাতাস বইতে থাকে পশ্চিম দিক থেকে। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান থেকে ভেসে আসে কেতকী, জুহি, বেলি প্রভৃতি পুষ্পের সুবাস। দূর কোনও গবাক্ষ থেকে ভেসে আসে গানের সুর, পূরবীর তানে গলা সাধছেন কেউ।

দুই কুমারের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুটা দূরে, মহতী নদীর তীরস্থ একটি প্রাসাদে। মালবে বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতদের আগমন ঘটলে এখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাসাদটি অনিন্দ্যসুন্দর। কুমারদের সুখ-সুবিধা পরিদর্শনের জন্য প্রহরী এবং অন্যান্য কিঙ্কর-কিঙ্করীদের নিয়োগ করা হয়েছে। দিবাভাগে কুমাররা অস্ত্রাভ্যাস করেন। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর অশ্বারোহণে মালবদেশ পরিদর্শনে বেরোন।

সন্ধ্যাবেলা কোনওদিন সভাগায়ক, কোনওদিন বাজিকর, বা কোনওদিন কোনও গল্পকথক আসেন কুমারদের মনোরঞ্জন করার জন্য। এঁদের মধ্যে একজনকে ভারী পছন্দ হয়েছে কুমার চন্দ্রগুপ্তর। উজ্জ্বল এবং চতুর এই যুবক একাধারে ঐন্দ্রজালিক, কথক এবং নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। নাম বেতালভট্ট। কুমার মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেন এই ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে তিনি বেতালভট্টকে পাটলিপুত্রে সঙ্গী করে নিয়ে যাবেন।

সন্ধ্যাকালে প্রাসাদের উদ্যানে পদচারণা করছিলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গী কুমার কচ। মালবে পদার্পণের পর থেকে পক্ষকাল কেটে গেছে। চারিদিক শান্তসুনিবিড়। কোথাও কোনও যুদ্ধঝঞ্ঝাটের চিহ্নমাত্র নেই। মনে মনে অধীর হয়ে উঠছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। যে উদ্দেশে তিনি মালবে এসেছিলেন তার তো কোনও লক্ষ্মণই দেখা যাচ্ছে না।

কুমার কচ জ্যেষ্ঠর অস্থিরতা অনুভব করতে পারছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আজ আপনাকে বড় অস্থির দেখাচ্ছে যুবরাজ। কোনও বিশেষ কারণ?'

যুবরাজ না হলেও জ্যেষ্ঠকে একান্তে এই নামেই সম্বোধন করেন কুমার কচ। চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্য কেউ গুপ্তসাম্রাজ্যের যুবরাজ তথা সম্রাট হতে পারেন, এ তিনি বিশ্বাস করেন না।'

'হ্যাঁ ভ্রাতা কচ। অতদূর হতে পিতৃআজ্ঞা রক্ষার্থে ছুটে এলাম। কিন্তু যুদ্ধের তো কোনও আয়োজনই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমার কী মনে হয় জানেন? রুদ্রসিংহ সংবাদ পেয়েছে যে আপনি সসৈন্যে এখানে উপস্থিত। তাই সে সহসা মালব আক্রমণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর প্রতি তাঁর এই অনুগত কনিষ্ঠটির ভক্তি ও ভালোবাসা অপরিসীম। তাই বলে এতটা বোধহয় তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারতেন না।

হাসি থামলে তিনি বললেন, 'তা নয় ভ্রাতা। না আমি পিতার মতো বীর, না আমার বীরত্বের কাহিনি ভারতদেশে সুপরিব্যপ্ত। আমার চিন্তা অন্যত্র। আমাদের এখানে টেনে আনা অন্য কোনও বৃহৎ পরিকল্পনার অঙ্গ নয় তো?'

উৎসুক হলেন কচ, 'কীরকম?'

'মালবের দূত এসে বলেছিল যে রুদ্রসিংহের সেনানী মালবের পথে আগুয়ান হয়েছে, আমাদের সাহায্য আশু প্রয়োজন। অথচ আমরা মালবে আসার পর পক্ষকাল অতিক্রান্ত, অথচ যুদ্ধের কোনও উদ্যোগই নেই। এই যুদ্ধের আবহ কি তাহলে কোনও প্রবঞ্চনার অংশবিশেষ? কোনওভাবে কি আমাদের মালববাস দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা চলছে?'

গম্ভীর হলেন কুমার কচ, 'যদি তা হয়ও, তাতে কার কী লাভ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রগুপ্ত, 'সেই কূটব্যাসটিরই তো অর্থোদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না প্রিয় কচ। এই অনর্থক বিলম্বের কোনও একটি কারণ তো আছে।'

কচ গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি বড় দ্রুত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ। হয়তো কালই দেখবেন যুদ্ধভেরি বেজে উঠেছে বিপুলনাদে।'

কুমার কচ-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিনই জানা গেল যে মালবের সীমানায় উপস্থিত হয়েছে রুদ্রসিংহের বাহিনী।

মালবরাজসভায় আপৎকালীন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী দণ্ডপানি, প্রবীণ অমাত্য বীরবাহু, সৈন্যাধিপতি জগৎস্বামী, এবং গুপ্তবংশের দুই কুমার। তর্ক-বিতর্ক চলছিল কোন পরিস্থিতিতে কী পরিকল্পনা নেওয়া হবে তাই নিয়ে।

সভা চলাকালীনই প্রতিহারী এসে নিবেদন করল যে রুদ্রসিংহের বার্তা নিয়ে শকদূত এসে উপস্থিত হয়েছে।

রুদ্রসিংহের দূত এসে দাঁড়ালে সবাই কিঞ্চিৎ নড়েচড়ে বসলেন। মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি গম্ভীর এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'বলো দূত, কী সমাচার এনেছ আমাদের জন্য?'

দূত যা জানালো তা মোটামুটি এরকম—

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে মহারাজ রুদ্রসিংহ এই সসাগরা ধরিত্রীর একমাত্র বৈধ অধিপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। তাই ঈশ্বরানুগৃহীত মহান সম্রাট রুদ্রসিংহের আদেশানুসারে এই বিশ্বচরাচরের যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম ভূসম্পত্তি, যাবতীয় জলচর, খেচর এবং ভূমিচর প্রাণী, যাবতীয় পশু প্রাণী উদ্ভিদ গুল্ম এবং ঔষধি, সবই তাঁর সম্পত্তি।

এতদসত্ত্বেও, মহামহিম শকসম্রাট অবশ্যই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল, এবং শান্তির প্রতিভূও বটে। তিনি চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে মালবদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারেন। যেমন করেছেন উত্তরকুরু, পুরুষপুর হতে শুরু করে বায়ব্যদেশের যাবতীয় জনপদসমূহকে। তবুও তিনি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মালবদেশকে সামূহিক ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি শেষ সুযোগ করে দিতে চান। এ অবশ্যই তাঁর মহত্ব এবং ঔদার্যের পরিচায়ক।

তার বিনিময়ে তিনি যা চান সে অতি সামান্য অর্ঘ্য।

এক, শকাধিপতির বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নিয়মিত করদান। দুই, রাজকন্যা ধ্রুবাকে তিনি নিজের দ্বাদশতম মহিষী হওয়ার মহান সম্মান অর্পণ করতে চান।

নেহাত দূত অবধ্য, নইলে সেদিনই সেই অর্বাচীনের মুণ্ডখানি স্বর্ণপাত্রে সাজিয়ে শত্রুশিবিরে পাঠাতেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি। চণ্ডক্রোধে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল তাঁর। তরবারিখানি কোষমুক্ত করে রক্তলাল চোখে হুঙ্কার দিলেন মহাক্রোধী মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি, 'যা রে অর্বাচীন, নিজের শিবিরে ফিরে যা। গিয়ে তোর ওই দুশ্চরিত্র লম্পট প্রভুকে গিয়ে বল অমন গর্ভস্রাবের তর্জনে ভীত হওয়ার মানুষ আমি নই। তোর প্রভুর মতো অমন প্রচুর সারমেয়কে লগুড়াঘাতে যমদ্বারে পাঠিয়েছি। প্রয়োজন হলে আবার পাঠাব।'

দূত অভিবাদন করে বিদায় নিল। তার ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে থাকা বক্রহাস্যটি কারও দৃষ্টি এড়াল না।

নিস্তব্ধ মালবরাজসভার নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে প্রথম প্রশ্ন করলেন কুমার চন্দ্রগুপ্তই, 'অতঃপর? আমাদের কী করণীয় এই মুহূর্তে?'

উঠে দাঁড়ালেন মন্ত্রী দণ্ডপানি, 'এই অপমানজনক সন্ধিতে সম্মত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রুদ্রসিংহের ওই অবাস্তব বাগাড়ম্বর অগ্রাহ্য করেও আমাদের মেনে নিতেই হবে সে আমাদের থেকে এখন বহুগুণে ক্ষমতাশালী। তার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও আমাদের চেয়ে বহুগুণে অধিক। এখন এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের উপায় কী?'

প্রবীণ অমাত্য বীরবাহু বললেন, 'আমার মতে আমাদের উচিত রুদ্রসিংহর শিবিরে একটি সম্মানজনক শর্ত নিয়ে দূত প্রেরণ করা। যেমন শুধুমাত্র করপ্রদান, বা রাজ্যের সামান্য অংশ দান। তাতে যদি তাঁকে এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়।'

সেনাপতি জগৎস্বামী বয়সে নবীন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'মানে? আপনি কী চাইছেন বীরবাহু? মালবদেশ ভীত কাপুরুষের মতো ওই নারীলোলুপ শক জন্তুটার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? আমাদের মধ্যে কি পৌরুষের অভাব ঘটেছে? আমরা কি ভীরু, দুর্বল, অবলা?'

বীরবাহু কঠিনস্বরে বললেন, 'আপনার শস্ত্রজ্ঞান অগাধ হলে কী হবে, শাস্ত্রজ্ঞানের কিছু অভাব দেখা যাচ্ছে সেনাপতি মহোদয়। শাস্ত্রে বলে সর্বনাশং সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। আমি আপনার বা মালবদেশের যোদ্ধাদের ক্ষমতাকে অসম্মান করছি না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর পথ নেই। শকসৈন্যবাহিনী এখন বিশাল, বিপুল। তাদের সেনানায়করাও একেকজন মহাশক্তিশালী যুদ্ধবিশারদ। তদুপরি রুদ্রসিংহের প্রধানমন্ত্রী নকুলদেবের মতো কুটিল এবং ধূর্ত কৌশলী মানুষ দ্বিতীয়টি নেই।

পরাজিত রাজ্যের অধিবাসী, বিশেষ করে তাদের নারীদের ওপর এই হিংস্র শকবাহিনী কী বর্বর অত্যাচার করে সে সংবাদ আমাদের কানে এসেছে। আমি চাই না সেই অকল্পনীয় সর্বনাশ মালবদেশের ওপর নেমে আসুক। তাই আমি সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে বৃহত্তর ক্ষতি এড়াতে চাইছি।'

সভাস্থলের গুঞ্জন কলরবের আকার ধারণ করল। সভাস্থ রাজপুরুষেরা অমাত্য বীরবাহুর বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করতে লাগলেন।

উঠে দাঁড়ালেন যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত, 'অমাত্য বীরবাহু যা বলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি মহারাজের সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তার পিছনে কিছু সুচিন্তিত কারণ আছে।

আমরা জানি যে বুভুক্ষু রাক্ষসের ক্ষুধাগ্নি কিছুতেই নির্বাপিত হয় না। একের পর এক সে তার শিকারকে গ্রাস করতেই থাকে। রুদ্রসিংহর প্রধান উদ্দেশ্য মালবদেশ অধিকার করা, শুধু নিয়মিত করলাভে সে সন্তুষ্ট হবে না। নইলে সে শুধুমাত্র প্রথম প্রস্তাবটিই পাঠাত, দ্বিতীয় প্রস্তাবটির মতো অসভ্য এবং অশ্লীল শর্তারোপের কথা ভাবত না। সে জানে যে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি প্রথম প্রস্তাব মেনে নিলেও নিতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই দ্বিতীয়টি মানবেন না। সে যুদ্ধ চায়, মীমাংসা নয়।রুদ্রসিংহর প্রধান উদ্দেশ্য মালবদেশ দখল করা নয়, নইলে সে শুধুমাত্র প্রথম প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত হত, দ্বিতীয় প্রস্তাবটির মতো অত্যাচারী অশ্লীল এবং ইতর শর্তারোপের কথা ভাবত না। তাই এক্ষেত্রে আমাদের উচিত সর্বোতভাবে যুদ্ধঘোষণা করা।'

জগৎস্বামী উৎফুল্লস্বরে বললেন, 'এই তো বীরের উপযুক্ত কথা। মহান গুপ্তবংশের যুবরাজের মুখে এই কথাই তো শুনতে চাই!'

বীরবাহু ভ্রুকুঞ্চন করে বললেন, 'কিন্তু কুমার, রুদ্রসিংহের বাহিনী মালব এবং গুপ্ত বাহিনীর থেকেও তিনগুণ বেশি শক্তিশালী। সেখানে আপনি কী করে...'

হাত তুলে বীরবাহুকে নিরস্ত করলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'বাহিনীর আকারের সঙ্গে তার সামগ্রিক শক্তির কোনও সম্পর্ক নেই অমাত্য। শক্তি আসে কৌশল থেকে, নৈপুণ্য থেকে, দর্প থেকে, আত্মবিশ্বাস থেকে—আক্রমণকারীর আকার থেকে নয়। তাহলে তো অরণ্যে সিংহ নয়, হাতিই পশুরাজ হতো।

জেনে রাখুন অমাত্য বীরবাহু, আক্রমণকারীর নৈতিকশক্তি সর্বদাই আক্রান্তর থেকে কম হয়। তাই পরাজয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখলেই তারা পিছু হটতে থাকে। তদুপরি শকসেনার অধিকাংশই বিজিত জাতি থেকে ধরে আনা সমর্থ পুরুষদাসদের দিয়ে তৈরি। তারা তাদের শোষণকর্তাদের জন্য প্রাণপাত করবে কেন?

মালবসৈন্যদল ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন সৈন্য। নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, নিজের সন্তানদের সুস্থ জীবনের জন্য, নিজের নারীদের সম্মানরক্ষার জন্য তারা প্রাণপণ সংগ্রাম করবে। জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় ওই জীবনপণ সংগ্রামটুকুই। আর রইল কৌশলের প্রশ্ন, তার জন্য তো আমরা রইলামই।'

পরদিন প্রভাতে শকবাহিনীর সঙ্গে মালব ও গুপ্ত যৌথবাহিনীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল।

শকবাহিনীর রণকৌশল অত্যন্ত উন্নতমানের। তদুপরি তাদের হাতে আছে পারস্য এবং গান্ধারদেশের বহু বিচিত্র অস্ত্রসমূহ। তাদের ব্যূহের অগ্রভাগ রক্ষা করছেন সেনাপতি হস্তীবর্মণ। ইনি বয়সে প্রবীণ এবং বিচক্ষণ

সেনানায়ক রূপে বিখ্যাত। দুইপক্ষ রক্ষা করছেন মহাবীর উগ্রসেন ও নাগদন্ত। এঁরা সার্থকনামা। উগ্রসেনের আগ্রাসী হিংস্রতা ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর নাগদন্তর মতো ধূর্ত এবং বিষবুদ্ধির সেনানায়ক বিরল। আর একটু দূরে উপস্থিত আছেন রুদ্রসিংহ স্বয়ং।

মালববাহিনীর দুইপার্শ্বভাগ রক্ষা করছেন যথাক্রমে সেনাপ্রধান জগৎস্বামী এবং কুমার চন্দ্রগুপ্ত। আর অগ্রভাগ রক্ষা করছেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি স্বয়ং। তিনি তাঁর বহুযুদ্ধের সঙ্গী, ঐরাবততুল্য মহাগজ নীলরাজের উপর আসীন।

যুদ্ধ শুরু হতেই চন্দ্রগুপ্ত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'জয় মহাকাল, হর হর মহাদেব!' সঙ্গে সঙ্গে মালব ও গুপ্তসৈন্যরা সগর্জনে তার প্রতিধ্বনি করল। উত্তরে শকসৈন্যরাও মহাঘোররবে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'জয় সর্বশক্তিমান রুদ্রসিংহের জয়!'

জ্যা-মুক্ত তিরের মতো শত্রুদের দিকে ধেয়ে গেলেন চন্দ্রগুপ্ত। আর তাঁর ঠিক পিছনে কুমার কচ। অশ্বারূঢ় চন্দ্রগুপ্তর অব্যর্থ শরচালনায় একের পর এক প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হতে থাকল। কুমার কচ অসিচালনায় অতিরথ। তদুপরি তিনি সব্যসাচী, দুই হাতেই অসিচালনায় দক্ষ। তিনি হুতাশনের মতো শত্রুসৈন্যদল দগ্ধ করতে থাকলেন। তাঁদের অনুগামী গুপ্তসৈন্যদল বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা আকারে খর্বকায় হলে কী হবে, ক্ষিপ্রতায় ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দ্রুত, অস্ত্রচালনায় অনায়াসদক্ষ এবং চাতুর্যে শৃগালের মতো ধূর্ত।

অন্যদিকে জগৎস্বামী হুহুঙ্কারে উগ্রসেনের সঙ্গে মহাযুদ্ধে রত হলেন। উগ্রসেন অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু জগৎস্বামী তারুণ্যের তেজে পরিপূর্ণ। তদুপরি তিনি সংগ্রাম করছেন নিজের মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থে। উগ্রসেন তাঁর শতেক উগ্রতাতেও জগৎস্বামীর আগ্রাসী যুদ্ধ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

মধ্যস্থলে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি এবং হস্তীবর্মণ মরণপণ সংগ্রামে রত ছিলেন। উভয়েই একাধিকবার রণস্থলে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছেন। একে অন্যের দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত। কেউই কারওর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেন না।

যুদ্ধ করতে করতেই চন্দ্রগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন এক তরুণ মালবসেনানায়কের যুদ্ধবিক্রম। তাঁর শরীর বেতসদণ্ডের মতো ঋজু অথচ নমনীয়। সারা শরীর কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই তরুণ অশ্বচালনা করছিলেন কালান্তক হুতাশনের মতো। আহা, কী অনায়াস যুদ্ধকৌশল, কী অপ্রমেয় রণনৈপুণ্য! তাঁর ক্ষিপ্র গতি, অনায়াস অস্ত্র চালনা, অব্যর্থ শরসন্ধান সবই অত্যুৎকৃষ্ট। যেমন বাড়বানল দহন করেছিল খাণ্ডববন, তেমনই তিনি ধ্বংস করছিলেন শকসৈন্যের একাংশ।

তবে শুধু চন্দ্রগুপ্ত নন, সেই সেনানায়ককে লক্ষ্য করছিলেন আরও একজন। শকাধিপতি রুদ্রসিংহ। গভীর অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর তাঁর মুখে এক দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। তিনি তাঁর পার্শ্বসহচরকে বললেন, 'কে এই সেনাধ্যক্ষ অভিরাম? আমাদের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচরদের নিয়োজিত করো এর প্রকৃত পরিচয় জানতে। সংবাদগ্রহণে ব্যর্থ হলে তাদের শূলে দাও। সঠিক সংবাদ আনলে পুরস্কৃত করো। এর প্রকৃত পরিচয় আমার চাই, যে-কোনও মূল্যে।'

যুদ্ধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তর অসাধারণ যুদ্ধকৌশলের জন্যই হোক, বা মালবসৈন্যের মরণপণ সংগ্রামের জন্যই হোক, শকসৈন্য দু-দিনেই রণে ভঙ্গ দিল। যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তর বলবীর্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি। একা তাঁর বলদর্পেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শকসৈন্যবাহিনীর আক্রমণ। আর প্রাথমিক জয়ের গন্ধ পেয়ে মালবসৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করল শকবাহিনীকে। দ্বিতীয় দিনের দিবাবসানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হল।

মালবদেশে সপ্তদিবসের জন্য রাষ্ট্রীয় উৎসব ঘোষিত হয়েছে। দেশের সর্বত্র আনন্দের এবং স্বস্তির আবহ। আর রাজপ্রাসাদে তো মহোৎসবের উচ্ছ্বাস চলছে। পান ভোজনের বিরাম নেই। দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ এবং নর্তকীদের আহ্বান করা হয়েছে যুদ্ধজয়ী বীরদের মনোরঞ্জনের জন্য। সেনাপতি জগৎস্বামী বিজয় ঘোষণার পরদিন থেকে সেই যে দেবী ধান্যেশ্বরীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বাকিদের অবস্থাও তদ্রুপ।

বিজয়োৎসব উদ্‌যাপনের এক সন্ধ্যা। চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলছে। এমন সময় সুযোগ বুঝে বিষয়টা মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির সামনে উত্থাপন করেই ফেললেন চন্দ্রগুপ্ত, ‘কে এই অসামান্য সেনানায়ক মহারাজ? এমন সেনানায়ক তো যে-কোনও বাহিনীর জন্য সম্পদ। এঁর যুদ্ধকুশলতায় আমি চমৎকৃত, মুগ্ধ। তাঁর সঙ্গে আলাপিত হতে চাই।’

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, ‘আসুন আমার সঙ্গে।’

মালব রাজপ্রাসাদ প্রস্তরনির্মিত। অলঙ্করণশোভার বাহুল্যমাত্র নেই। দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও সাধারণ। এই দেশের রাজপরিবার চিরকালই ব্যক্তিগত সুখসুবিধার থেকে প্রজানুরঞ্জনকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। তাই রাজৈশ্বর্যের অহৈতুকী প্রদর্শনে তাঁদের কোনওদিনই রুচি ছিল না।

সেই নাতিবৃহৎ প্রাসাদের অলিন্দ পেরিয়ে, একাধিক প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, প্রশস্ত গলিপথ দিয়ে একটি উদ্যানে এসে উপস্থিত হলেন দুইজনে। উদ্যানটি বড়ই মনোরম। কেতকী, যূথি, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পগন্ধে চারিদিক আমোদিত। পূর্ণচন্দ্রের আলোয় প্রস্ফুটিত সেই ক্ষুদ্র বনখণ্ডটিকে স্বর্গের পারিজাত বন বলে ভুল হতে পারে।

উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি সরোবর। সরোবরের ধারে একটি নাতিবৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বৃক্ষটির সানুদেশে একটি বেদী। তার উপর বসে দুইটি অবয়ব নিভৃত আলোচনায় মগ্ন ছিল। মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি সেখানে উপস্থিত হয়ে মৃদু শব্দ করলেন। দুইজনে সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁদের কমনীয় মুখ দুখানি। চন্দ্রগুপ্ত দেখলেন তাঁর সামনে অসামান্যা সুন্দরী দুই নারী!

চন্দ্রজ্যোতি কোমলস্বরে বললেন, ‘মা ধ্রুবা, যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পারঙ্গম দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে সবিশেষ উৎসাহিত। তাই তাঁকে এখানে নিয়ে এলাম।’

চন্দ্রগুপ্ত বজ্রাহত হয়ে গেলেন। এই অসামান্যা সুন্দরী নারীই সেই দুর্ধর্ষ রণকুশল সেনানায়ক? হা ঈশ্বর!

রাজকুমারী ধ্রুবা সামান্য ঝুঁকে বললেন, ‘শাস্ত্রে বলে বিপদের দিনেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। কুমার চন্দ্রগুপ্ত, মালবদেশের মহাসঙ্কটের দিনে গুপ্তবংশের এই সাহায্য আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

চন্দ্রগুপ্ত মেধাবী এবং বাকপটু। কিন্তু তাঁর মুখে কথা সরল না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে এই লাবণ্যসুধাকে দেখছিলেন। এই দীর্ঘাঙ্গী, সুতন্বীই সেই দুর্ধর্ষ তরুণ যোদ্ধা? আহা, বিধাতা কী রূপই না দিয়েছেন এই তিলোত্তমাকে। পদ্মদলসদৃশ আঁখিদুটিতে, উদ্ধত মরালগ্রীবায়, আজানুলম্বিত মৃণালবাহুতে মনে হচ্ছে যেন এক আশ্চর্য স্থিরবিদ্যুৎ পুঞ্জীভূত হয়ে আছেন তাঁর সামনে।

চন্দ্রগুপ্ত ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে কী যেন একটা বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। অর্থহীন কিছু শব্দসমষ্টি বলে, বাক্য অর্ধসমাপ্ত রেখে, সামান্য কথার খেই হারিয়ে, তিনি শেষে কাশতে লাগলেন। বোধহয়

ধন্যবাদের উত্তরে কিছু প্রতিধন্যবাদের প্রয়াস করছিলেন। কিন্তু অপ্রস্তুত এবং অপরিণত কিশোর প্রেমার্থীর প্রথম প্রেম নিবেদনের মতো তাঁর দ্বিধাজড়িত বাক্য কারও বোধগম্য হল না।

যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে কাশতে দেখে চন্দ্রজ্যোতি উদ্বিগ্ন হলেন। বললেন, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন যুবরাজ? বিশ্রাম করবেন?' বলতে বলতেই তাঁর ইশারায় দুইজন রক্ষী কাছে এসে দাঁড়াল। তাঁদের সঙ্গে দুইজনে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন।

অন্য তরুণীটি রাজকন্যা ধ্রুবাকে ঠেলা মেরে বললেন, 'কী সখী, শাস্ত্রবচন মনে আছে তো? পূর্বরাগের প্রথম লক্ষণ নাকি বিপ্রলম্ভ, আর তারও প্রথম ভাগ নাকি সাক্ষাৎ দর্শন।'

ধ্রুবা অতি চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'কথা হচ্ছিল আমাদের আসন্ন বনভোজনের পরিকল্পনা নিয়ে। এর মধ্যে তুই পূর্বরাগ কোথায় খুঁজে পেলি মন্দা?'

মন্দা চতুর ও ছদ্মবিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'হে বরবর্ণিনী, হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মালবসৌভাগিনী, বনভোজনে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে আমন্ত্রণ জানানোর অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

ধ্রুবা বিব্রতস্বরে বললেন, 'আহা, আবার ওঁকে কেন? কুমারের হয়তো যুদ্ধের ক্লান্তি দূর হয়নি। এই অবস্থায় ওঁকে বিব্রত করা কি ঠিক হবে?'

মন্দা ভারি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, 'আহা, সেই জন্যই তো ওঁকে আমন্ত্রণ জানানো। আমি তো আপনার সান্নিধ্য ব্যতীত ওঁর ক্লান্তি অপনোদনের আর কোনও উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি না।'

ধ্রুবার গণ্ডদেশদুটি রক্তিম হয়ে উঠল, 'আহ, কী হচ্ছে মন্দা!'

মন্দা হো হো করে হেসে উঠলেন, 'যুবরাজ তো দেখি প্রথম দর্শনেই পর্যুদস্ত একেবারে! এমন মদনবাণ হানতে কোথায় শিখলি ভাই? আমাকেও একটু শিখিয়ে দে না।'

ধ্রুবা ছদ্মকোপে বললেন, 'আহ, প্রগলভতা বন্ধ কর মন্দা। দেখছিস উনি সুস্থ নেই...'

মন্দা মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ জানি। প্রেমজ্বর।'

ধ্রুবা এবার নিজেও হেসে ফেললেন, 'ধুর পাগলি। তোর মুখে কিছু আটকায় না। চল, এবার ভিতরে চল। অনেক রাত হল।'

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মন্দার মনস্কামনার প্রতি প্রজাপতি ব্রহ্মার সস্নেহ সম্মতি আছে। মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি যুদ্ধজয়ের পর যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে আরও কিছুদিন মালবদেশে অবস্থিতির অনুরোধ জানালেন। যুবরাজ প্রথমে না না করছিলেন বটে, কিন্তু শেষাবধি সম্মত হলেন। যদিও প্রাসাদের কর্ণময় প্রাচীরগুলি জানে সেই নেতি নেতি ভাবের মধ্যে কতখানি চেষ্টাকৃত অভিনয় লুকিয়ে ছিল। তার অন্যতম কারণ ছিল রাজকুমারীর উদ্যোগে আয়োজিত বনভোজনে যোগদানের জন্য মন্দার সাদর আমন্ত্রণ।

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় যখন কুমার চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমার কচ দুজনে সেই উদ্যানে এসে উপস্থিত হলেন, তখন মালবের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ কেদার মিশ্র ইমন কল্যাণে আলাপ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক-যুবতীরা উপস্থিত হয়েছেন সেখানে।

মন্দা সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন তাঁদের। ধ্রুবার ডানপাশের আসনটি আগে থেকেই শূন্য রাখা ছিল। মন্দা সযতনে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে সেখানে অধিষ্ঠিত করলেন।

কুমার কচ নির্নিমেষে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দুই কর যুক্ত করে মাথায় ঠেকালেন, অস্ফুটে বললেন, 'জয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয়, জয় মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর জয়।'

মন্দা বললেন, 'কিছু বললেন কুমার?'

কচ বললেন, 'কিছু না। বলছিলাম যে আপনার ষড়যন্ত্র, ইয়ে, মানে ব্যবস্থাপনা অতুলনীয়।'

মন্দা মুখ টিপে হাসলেন, কিছু বলল না।

এদিকে কেদার মিশ্রের আলাপ তখন বিস্তার লাভ করেছে। অসহ জ্যোৎস্নার মাদকতায় মিশে যাচ্ছে দয়িত মিলনের জন্য প্রিয়ার আকুতি। বৃক্ষপত্রের অন্তরালে পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত। পুষ্পরাজির সুমধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। মহার্ঘ পৈষ্ঠী ও মাধ্বীর রসেরও কিছু বিস্তার ঘটেছে শ্রোতৃবর্গের মনে। কেদার মিশ্র গাইছেন 'মে গৌরবর্ণম্ হর্য, কৃষ্ণত্বকম্ দেহি মে। যদি মম প্রিয়সঙ্গ দদাতি তর্হি অহং রাত্রৌ সহ একঃ ভবিতুম।' আমার গৌরবর্ণ হরণ করে দয়িতের কৃষ্ণবর্ণ দান করো, যাতে আমি রাত্রির অন্ধকারে মিশে যেতে পারি। আবিষ্ট শ্রোতারা গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন। আর কুমার চন্দ্রগুপ্ত আড়ে আড়ে একবার ধ্রুবার তপ্তগৌরবর্ণ এবং নিজের তাপদগ্ধ কৃষ্ণবর্ণের দিকে তাকাচ্ছেন।

একটু পরে গানের তাল দ্রুত হল। কেদার মিশ্র গাইছেন, 'রাত্রৌ যদা চন্দ্র প্রকাশতে, মম শরীরং প্রজ্জ্বলিতং ভবতি তদা। অহম বদামি তর্হি এতত বীথিং মা ভ্রমতু, আগচ্ছতু। প্রিয়ম যদা আগত্য প্রকাশয়সি, তস্মিন রাত্রৌ তং শরীরৈ সহ মিলিষ্যসি।' এই চন্দ্রজোছনায় আমার সমস্ত অঙ্গ জ্বলে যায়, আমি তাকে মিনতি করি আজ এসো না আমার কুটিরে। যেদিন আমার দয়িত আসবে মিলনের জন্য, সেদিন এসো, হে সোম, সেদিন এসো।

শ্রোতাদের রক্তে লাগে দোলা, বুকের মধ্যে মাতন। তরুণ-তরুণীরা উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত নৃত্য শুরু করলেন। মন্দা জোর করে ধ্রুবা এবং চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে এলেন তার মধ্যস্থানে। বীণার ঝঙ্কার আরও উদ্ধত, তালবাদ্য আরও অহঙ্কারী, মোহনবংশী আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল। সমবেত যুবক-যুবতীরাও গাইতে লাগলেন, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। শরীরে শরীর আরও ঘন হয়ে এল, নয়নে নয়ান। আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে গেল, হৃদয়ে হৃদয়।

একটু পরেই গান বন্ধ হতে তরুণ-তরুণীরা থেমে গেলেন। ধ্রুবা তাঁর ঘূর্ণনবেগ সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন, কুমার চন্দ্রগুপ্ত এক হাতে তাঁর দেবদুর্লভ কটিদেশ ধারণ করে তাঁকে সেই পতন থেকে রক্ষা করলেন। ধ্রুবা নিমেষমাত্র চন্দ্রগুপ্তর দিকে তাকালেন। তারপর লজ্জায় দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন।

ধ্রুবা এবং মন্দার ঐকান্তিক আগ্রহে কুমার কচ-এর দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা হল ধ্রুবার অন্তর্মহলে। রাজকুমারীর অন্তর্মহলে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ, স্বয়ং মহারাজকেও অগ্রিম সংবাদ পাঠিয়ে তবে আসতে হয়। কিন্তু কুমার কচ মহাবীর এবং ধুরন্ধর অসিধারী হলে কী হবে, বয়সে প্রায় কিশোর বললেই চলে। ধ্রুবা পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁর অতৃপ্ত জ্যেষ্ঠাস্নেহ এই বীর অথচ সরল কিশোরটির ওপর অবিরল ধারায় বর্ষিত হতে লাগল।

কুমার কচ-এরও কোনও সহোদরা নেই। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে ধ্রুবাকে নিজের অগ্রজার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। স্নেহের ক্ষুধা বড় ক্ষুধা। সে কেবলই ভালোবাসার কাঙাল মানুষকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে চলে। আর সে বাঁধনের টান এড়ায় এমন সাধ্য কার?

কুমার কচ সাগ্রহে এবং সগৌরবে রাজকুমারী ধ্রুবার স্নেহের শিকলে বাঁধা পড়লেন।

কুমার প্রভাতের শারীরিক ব্যায়ামাদি এবং শস্ত্রচর্চা করেই ছুটে আসতেন ধ্রুবার অন্তর্মহলে। তাঁর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল ধ্রুবার সামনে কুমার চন্দ্রগুপ্তর গৌরবগাথা কীর্তন করা। এবং তাতে এক অন্ধ অগ্রজভক্ত কিশোরের মনঃকল্পনাও মিশে থাকত অনেকটা। কুমার চন্দ্রগুপ্তর যে পরিমাণ শত্রুনিপাতের কাহিনি কচ বর্ণনা করতেন, সেসব সত্যি হতে গেলে চন্দ্রগুপ্তর বয়স অর্ধশতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিক হতে হয়। কিন্তু তাতে কুমার কচ-এর উৎসাহের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হলে তো! উপরন্তু তাঁর ভাষ্য শুনে মনে হত নেহাত ঘোর কলিকাল না হলে চন্দ্রগুপ্তর মতো দিগ্বিজয়ী বীর অনায়াসে দৈত্যদানবাদি বধ করে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হতেন। আর শচীর পদ

অলঙ্কৃত করার জন্য যে সুরনারীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, সে কথাটাও কচ বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিতেন। ধ্রুবা কিছু বলতেন না। শুধু মুখ টিপে হাসতেন।

কুমার চন্দ্রগুপ্ত প্রায়শই মালবরাজসভায় আসা শুরু করলেন, পিতার আদেশানুসারে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির কাছ থেকে রাজকার্য শিক্ষার বাসনায়। এদিকে রাজকুমারী ধ্রুবা রাজ্যশাসনের বেশ কিছু বিষয়ে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির একান্ত সহায়। ফলে রাজ্যশাসন বিষয়ে পরামর্শ আদানপ্রদানের ব্যাপারে দুজনের প্রায়ই দেখা হতে লাগল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই অভিজ্ঞ সভাসদরা বুঝলেন, এই দুই তরুণ-তরুণী শুধু শাসন-পরামর্শ নয়, একে অন্যকে আরও অনেক কিছু দান করে বসেছেন।

যিনি প্রবীণ তিনি উপদেশ দিয়ে থাকেন যে ঘৃত এবং অগ্নি কখনই একত্রে রাখা উচিত নয়। কিন্তু যিনি প্রাজ্ঞ তিনি জানেন ও ছাড়া সমাজ সংস্থিতি রক্ষা হয় না।

গুপ্তসৈন্যদের মালব আগমনের পর মাসাধিককাল গত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ প্রায়। গুপ্তচরেরা সংবাদ এনেছে শকসৈন্য ফিরে গেছে নিজেদের দেশে। আশু তাদের থেকে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি কুমারকে কার্তিনীতিক, নৈমিত্তিক এবং মোহুর্তিক, এই তিন প্রকার গুপ্তচরবাহিনীর পার্থক্য বোঝাচ্ছিলেন। সেনাপতি জগৎস্বামী, মন্ত্রী দণ্ডপানি এবং ধ্রুবাও উপস্থিত ছিলেন। একটু দূরে সমাহর্তা, সন্নিধাতা এবং দণ্ডপাল অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। এমন সময় প্রতিহারী এসে জানাল গুপ্তমন্ত্রীমণ্ডলীর বিশেষ দূত এসে পৌঁছেছে। মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতি এবং কুমার চন্দ্রগুপ্তর আশু সাক্ষাৎ চান।

কুমার চন্দ্রগুপ্তর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আসার সময় পিতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখে এসেছেন। দূত কোনও অমঙ্গলসংবাদ নিয়ে আসেনি তো? উদ্বিগ্ন হলেন ধ্রুবাও। মালবরাজ শশব্যস্ত হয়ে আদেশ দিলেন দূতকে এখনই সভায় উপস্থিত হওয়ার।

সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত দূত এসে প্রণাম করে জানাল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর শেষ দিন আসন্ন। তিনি জেনে সুখী হয়েছেন যে তাঁর মধ্যমপুত্র গুপ্তবংশের গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। তিনি বাল্যবন্ধু তথা মালবরাজের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করেন। আপাতত তাঁর ইচ্ছা ধরাধাম ত্যাগের পূর্বে একবার তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মুখচন্দ্রমা দর্শন করার। কুমার চন্দ্রগুপ্ত যেন পত্রপাঠ সসৈন্যে পাটলিপুত্র প্রত্যাবর্তন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে দ্রুত কক্ষ হতে নিষ্কাষিত হলেন। তাঁকে যাত্রার উদ্যোগ করতে হবে। ধ্রুবার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

চারিদিকে যাত্রার উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। গুপ্তসৈন্যরা মাসাধিককাল ঘরছাড়া। তারা মহা উৎসাহে, মহা সমারোহে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। শুধু যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত পাংশুমুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কঠিন কঠোর কর্তব্য একদিকে, আর একদিকে হৃদয়ের টান। এর দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হতে লাগলেন তিনি।

কচগুপ্ত দ্বিধায় পড়লেন। নিজের দেশ ছেড়ে থাকা যায় না। আবার এই মাতৃরূপিণী জ্যেষ্ঠাকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। জ্যেষ্ঠভ্রাতার শুষ্ক বিষণ্ণ মুখ তাকেও ভারি পীড়া দিতে লাগল।

পরদিন আহারের সময় কচ দেখলেন রাজকুমারীর মুখ ভার। মন্দা সচরাচর হাস্যকৌতুকে মাতিয়ে রাখেন। তাঁরও মুখে হাসি নেই। আজ আর হাসি গল্প আলোচনা কিছুই হল না। কচ চুপচাপ আহার করতে লাগলেন।

আহার শেষে ধ্রুবা প্রশ্ন করলেন, ‘কবে যাত্রা শুরু করবে ভাই?’

কচ উত্তর দিলেন, ‘রাজপণ্ডিত বলেছেন পরশু দ্বিপ্রহর যাত্রা শুরুর পক্ষে উত্তম সময়।’

‘তোমাদের প্রস্তুতি শেষ? যা যা সঙ্গে এনেছিলে মনে করে নিয়েছ তো? কিছু ফেলে যাচ্ছ না তো?’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কচ। কী ফেলে যাচ্ছেন, সে যদি মুখ ফুটে বলতে পারতেন।

খানিক পর রাজকুমারী সজলচক্ষে জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, ‘ভাই কচ, দেশে ফিরে এই অভাগিনী জ্যেষ্ঠাকে ভুলে যাবে না তো? মাঝে মাঝে পত্র দিও। আর যদি কখনও এমন বিপদে পড়ি, আমাকে উদ্ধার করতে আসবে তো ভাই?’

কচগুপ্ত এই সদ্যলব্ধ অগ্রজাকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টে ম্রিয়মাণ হয়েই ছিলেন। তাঁর চক্ষুদুখানি জ্বালা করে উঠল। তিনি বললেন, ‘কথা দিলাম দিদি। তোমার বিপদের দিনে আর কেউ তোমার পাশে থাকুক না থাকুক, কুমার কচগুপ্ত অবশ্যই থাকবে।’

ধ্রুবা কিছু বললেন না। শুধু তাঁর রক্তবর্ণের উত্তরীয়টির প্রান্তখানি ছিঁড়ে কুমার কচের মণিবন্ধে বেঁধে দিলেন। একফোঁটা তপ্ত অশ্রু এসে পড়ল তার উপর।

সারারাত কুমার কচের ঘুম এল না। তিনি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। নিদ্রার মধ্যে রাজকুমারী ধ্রুবার ছলছল নয়ন কেবলই তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। কী উপায়ে তাঁকে ছেড়ে যেতে না হয়, অথচ পাটলিপুত্র যাত্রাও সুসম্পন্ন হয় সে কথাই আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরোতে যাবেন, দেখলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত অলিন্দে দাঁড়িয়ে একাগ্র এবং উদাস দৃষ্টিতে মালবরাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। জন্মাবধি তিনি অগ্রজকে এমন বিস্রস্ত, এমন উদাস, এমন বিষণ্ণ দেখেননি।

কুমার কচ সন্তর্পণে শুয়ে পড়লেন। একটি পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছে। আজই তা প্রয়োগের প্রকৃষ্ট দিন।

পরদিন প্রভাতে কুমার কচ যখন মালবরাজসভায় প্রবেশ করলেন, তখন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি অতিথিদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শৌল্কিক এবং গৌল্মিকরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। সন্নিধাতা বসে আছেন হিসাবরক্ষকদের নিয়ে, সঙ্গে রাজকোষের সমতাপত্র। মহারাজের আদেশ, বিদায় অভ্যর্থনা রাজকীয় হওয়া চাই। আর সঙ্গে যাওয়া চাই প্রচুর উপঢৌকন, বিপদকালে মালবদেশকে সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ।

কুমার কচকে দেখে তিনি রাজকার্য স্থগিত রাখলেন। এই অসমসাহসী কিশোরটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি। সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, ‘রাজকুমার কচ যে, সব কুশল তো? যাত্রাপ্রস্তুতি সম্পূর্ণ?

কুমার কচগুপ্ত তাঁর কিশোর বয়সের পক্ষে যতটা গম্ভীর হওয়া সম্ভব ততটা গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘সব কুশল মঙ্গল মহারাজ। আপনার সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ছিল মহারাজ।’

বলুন কুমার কচ।

কচ আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘একান্তে।’

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির মুখে স্নেহমিশ্রিত কৌতুকের হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন, ‘এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কুমার কচ। আপনি আপনার বক্তব্য নির্দ্বিধায় এঁদের সামনে বলতে পারেন।’

কচ গম্ভীরমুখে বললেন, ‘মহারাজ, গুপ্তবংশ সদ্য এক মহাবিপদ থেকে মালবদেশকে উদ্ধার করেছে। সেই অধিকারে আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি।’

‘বলুন কুমার। সম্ভব হলে অবশ্যই তা পূরণ করা হবে।’

‘আমি গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাটের জন্য রাজকুমারী ধ্রুবার পাণিপ্রার্থনা করতে এসেছি।’

সভাস্থ পারিষদবর্গ চমকিত হলেন। মালবরাজকুমারী গুপ্তবংশের পট্টমহিষী হবেন এ তো সমগ্র মালবদেশের জন্য গৌরবের কথা। কিন্তু সে প্রস্তাব তো স্বয়ং সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর কাছ থেকে আসার কথা।

চন্দ্রজ্যোতিও যথেষ্ট বিব্রত হলেন। কন্যা বাল্যবন্ধুর পুত্রবধূ হবেন, এ তো তাঁর জন্যও বড় আনন্দ এবং স্বস্তির সংবাদ। কুমার কচ নিতান্তই ছেলেমানুষ। তাঁর কথায় এতবড় সম্মতি দেন কী করে?

কচ গম্ভীরমুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে মহারাজ কিঞ্চিৎ দ্বিধায় আছেন। দ্বিধার কারণ জানতে পারি কি?'

মহারাজ সস্মিতমুখে বললেন, 'আপনার অনুরোধ আমার বিশেষ আনন্দের কারণ কুমার। কিন্তু আশা করি বুঝবেন যে, এই প্রস্তাব যদি স্বয়ং সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর কাছ হতে আসত...'

কচ বোধহয় বুঝলেন মহারাজের দ্বিধার কারণ। তিনি কোষ হতে তরবারি উন্মুক্ত করে বললেন, 'আপনার দ্বিধার কারণ অনিস্বীকার্য মহারাজ। কিন্তু আমি গুপ্তরাজবংশের কুমার। আমার প্রতিশ্রুতি মানে সমগ্র গুপ্তবংশের প্রতিশ্রুতি। আমি এই তরবারি স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে রাজকুমারী ধ্রুবা অবশ্যই গুপ্তবংশের মহাদেবী হবেন। শুধু তাই নয়, আমি চাই রাজকুমারী ধ্রুবা আমাদের সঙ্গে পাটলিপুত্রে প্রত্যুদগমন করুন। তিনি আমাকে নিজের ভ্রাতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমি ইতিমধ্যেই তাঁকে আমার বহুঠাকুরানির পদে আসীন করেছি। তাঁর সম্মান এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায় একমাত্র আমার।'

অত্যধিক হর্ষ এবং উল্লাস কখনও কখনও মানুষকে মূক করে দেয়। মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি আনন্দস্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। সভাসদরা সাধু সাধু রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন।

পাটলিপুত্র পৌঁছতে এখনও অনেক পথ বাকি। বিশাল সৈন্যবাহিনীর দল নিয়ে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত ফিরে চলেছেন পাটলিপুত্র। পথশ্রমে বিশ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে সবার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। তার একটি কারণ যদি হয় বহুদিন পর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে চলেছেন গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাবী মহিষী, মালবরাজকন্যা
ধ্রুবা।

ইতিমধ্যেই চন্দ্রগুপ্তর ঘনিষ্ঠ সেনানায়কদের মধ্যে রাজকুমারীকে প্রীত করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। ধ্রুবার মুখ থেকে বাক্য স্খলিত হলেই হল, মুহূর্তের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি এনে উপস্থিত করে। মাঝে মাঝে সেই আগ্রহের আধিক্য দেখে ধ্রুবা খিলখিলিয়ে হাসতে থাকেন।

গুপ্তবাহিনী মালব থেকে পাটলিপুত্র পৌঁছবার সংক্ষিপ্ততম পথটি ধরেই চলেছে। এ পথ ভুজপাল থেকে শুরু করে জাবালিপুর হয়ে বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে পাটলিপুত্র পৌঁছয়। অরণ্যের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ সে পথ যেমন মনোরম, তেমনই নয়নমুগ্ধকর।

ধ্রুবা তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে এই যাত্রা উপভোগ করছিলেন। এই গহীন বনরাজি, এই আদিম মহাদ্রুমসারি, বনজ পুষ্পের সুগন্ধ, সুমিষ্ট ঝরনার জল সবই বড় নতুন লাগে তাঁর। প্রতি রাত্রিতেই গহন বনমাঝে শিবির স্থাপনা হয়। শিকার করে আনা বন্যকুক্কুট এবং শূকর শূলপক্ক করে আহার করা হয়। সঙ্গে থাকে শালপাতায় আনা বনজ মধু। তার অতুলনীয় মনোমুগ্ধকর স্বাদে ধ্রুবা মুগ্ধ হয়ে যান।

এই অঞ্চলের বনবাসী জনজাতি বহুদিন যাবৎ গুপ্তবংশের অধীন করদ জাতি। এরা বনজ এবং খনিজ সম্পদ সরবরাহের বিনিময়ে ভূমি তথা জল-জঙ্গলের উপর নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে। তারাও চায় গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাবী মহারাজ্ঞীকে প্রীত করতে। তাই স্থানে স্থানে বনমণ্ডলের মণ্ডলপতির স্ত্রী-কন্যারা ধ্রুবাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁদের কুটিরে রাত্রিবাস করতে। আর ধ্রুবার কাছেও এই অভিজ্ঞতা নতুন। তিনিও সানন্দে তাদের আতিথ্য স্বীকার করছেন। তিনি অনায়াসে মণ্ডলপতির স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে সই

পাতাচ্ছেন, তাঁদের বেশ ধারণ করছেন, তাঁদের পাকশালে গিয়ে রান্না করছেন, তাঁদের সঙ্গে রাত্রির বহ্ন্যুৎসব ও সমবেত নৃত্যগীত এবং পানভোজনে অংশ নিচ্ছেন। এসব তাঁর কাছেও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আর এসবই দুচোখ ভরে দেখছেন একজন, কুমার চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর চোখে অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্ঞীর ছবি ফুটে উঠছে। তিনি ঠিক ধ্রুবার মতো। কোমল, শান্ত, হাস্যোজ্জ্বল। এই নদীবিধৌত শস্যশ্যামলা ভূমির অধিশ্বরী তিনি। তিনি শাকম্ভরী, যুদ্ধনিপুণা, বরদপ্রিয়া। তাঁর আশিসে ইন্দ্রদেব যথাযথ বারিবর্ষণ করেন, গাভীগণ দুগ্ধবতী হয়। তিনি রাজসূয়যজ্ঞস্থলে অগ্নিতে পুরোডাশ, অপূপ, চরু এবং বপা অর্পণ করেন। আর এই সসাগরা জম্বুদ্বীপ স্নেহে, প্রেমে, ঔদার্য্যে তাঁর বশীভূত হয়।

আর এই অমূল্য স্ত্রীরত্ন, নিজ পুরুষাকারে অর্জিত এই স্ত্রীরত্ন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত। উদ্দেশ্য এই যে অর্ধজম্বুদ্বীপবিজেতা সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যেন তাঁর ভাবী বধূর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎটুকু করে যেতে পারেন।

তবে শুধু শেষ সাক্ষাৎই নয়, যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তর অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল।

গুপ্তরাজসভার রাজন্যরা জানেন যে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকেই নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সম্রাটের প্রথম সন্তান নন। তাই সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর অবর্তমানে গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার অর্পিত হওয়ার কথা তাঁর প্রথম পুত্র রামগুপ্তর ওপর।

অথচ সমস্ত গুপ্তসাম্রাজ্য জানে, গুপ্তরাজসভার রাজন্যবর্গ জানেন, এমনকী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের প্রাচীরগুলি অবধি জানে যে রামগুপ্ত অপদার্থ, রামগুপ্ত কুটিল, রামগুপ্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং রাজ্যশাসনের পক্ষে সর্বাংশে অযোগ্য।

তাহলে উপায়?

উপায় একটিই। মৃতপ্রায় সম্রাট যদি রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে রাজমুকুট চন্দ্রগুপ্তর হাতে সমর্পণ করেন, তবেই চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা হবে।

আর যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত চাইছেন তাঁর পিতা যেন রাজ্যের ভাবী রাজমহিষীকেও দেখে যেতে পারেন। তিনি তাঁর পিতাকে অতি উত্তমরূপে চেনেন।

বিন্ধ্যাচলের পথে একটি অতিবৃহৎ অরণ্যজনপদে শিবির স্থাপিত হয়েছে গুপ্তবাহিনীর। চরেরা এসে সংবাদ দিয়েছে এ নাকি দেবী বিন্ধ্যবাসিনী পর্ণশবরীর আরাধনাস্থল। দেবী পর্ণশবরী এখানে ব্যাধ, পুলিন্দ এবং শবরদের আরাধ্যা দেবীরূপে পূজিতা হন।

ধ্রুবা গেছেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে পূজার্পণ করতে। সঙ্গে একশ একটি ছাগ। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী রুধিরপ্রিয়া। তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ছাগবলি বিশেষভাবে সুপ্রযুক্ত।

এমন সময় কুমার চন্দ্রগুপ্তর কাছে দুজন ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষ এসে উপস্থিত হল। তারা গুপ্তসাম্রাজ্যের দূত।

ধ্রুবা পূজার্পণাদি সাঙ্গ করে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে অকস্মাৎ শিবিরের পরিস্থিতি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কুমার চন্দ্রগুপ্ত অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন।

ধ্রুবা বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘কী ব্যাপার কুমার। আপনাকে এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন?’

কুমার যা বললেন শুনে ধ্রুবার উদ্বেগ বহুগুণে বর্ধিত হল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের দূত এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে গভীর দুঃসংবাদ। বৃদ্ধ রাজা কোনওমতে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ধরে রেখেছেন। চন্দ্রগুপ্তকে এই মুহূর্তেই রাজার সম্মুখে উপস্থিত থাকতে হবে।

ধ্রুবার হাতদুটি নিজের করতলে দৃঢ়ভাবে ধরলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'আমাকে যেতেই হবে ধ্রুবা, এখনই যেতে হবে। আর সময় নেই। বিশ্বাস করো, তোমাকে এভাবে একাকী ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত। তুমি তো জানো, পিতার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আমাদের দুজনের ভবিষ্যতের জন্যই প্রয়োজনীয়। চিন্তা কোরো না, তোমার সুরক্ষার জন্য কচকে রেখে গেলাম। শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে।'

ধূলিধূসরিত দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল চন্দ্রগুপ্তর বেগবান অশ্বটি। সেদিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মুছলেন ধ্রুবা। তারপর কুমার কচকে ডেকে বললেন যাত্রা শুরু করতে। নিজেকে প্রবোধ দিলেন, তিনি মহান গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাবী পট্টমহিষী। প্রিয় বিরহে এত উদাসীন হওয়া কি তাঁর শোভা পায়? তাছাড়া, কচ তাঁকে জানিয়েছেন এখান থেকে পাটলিপুত্র আর মাত্র চারটি দিনের পথ। খুব শীঘ্রই নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে চলেছে। আর তার পরেই দুজনের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

পাটলিপুত্র আর মাত্র একদিনের পথ। ধ্রুবা এখন যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে নাকি মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। পাষাণী অহল্যাকে এখানেই মুক্ত করেছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। সেখান থেকে কোসলের দক্ষিণপ্রান্ত ছুঁয়ে যাত্রা আরও পূর্বদিকে।

পথে পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গা। তাঁর তীরে ষোড়শোপচারে পূজা দিলেন ধ্রুবা। না নিজের জন্য নয়, কুমার চন্দ্রগুপ্তর জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করলেন। একান্নটি ছাগবলি দিলেন, তাদের মাংসে ভূরিভোজন করল গুপ্তসেনানী এবং সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা।

ধ্রুবা দেখছিলেন পাটলিপুত্র যত কাছে আসছে, কুমার কচ ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। ওই দেখা যায় প্রাসাদের শিখরচূড়া। আর মাত্র অর্ধদিবসের পথ। কুমার কচ এতদিন বাদে স্বভূমে ফিরছেন। তাঁর মুখমণ্ডল তো উল্লাসে উজ্জ্বল হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর মুখে অনিশ্চয়তার অন্ধকার কেন?

ধ্রুবা তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল ভাই। এত উৎকণ্ঠা কীসের?'

কচগুপ্ত উত্তর দিলেন, 'এতক্ষণে তো যুবরাজের রাজ্যারোহনের সংবাদ নিয়ে দূত আসার কথা জ্যেষ্ঠা। গুপ্তবংশের ভাবী রাজমহিষী আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার কোনও উদ্যোগ দেখছি না কেন?'

ধ্রুবার ভ্রু কুঞ্চিত হল। কচের কথার যুক্তি আছে বটে।

দেখতে দেখতে ধ্রুবার সৈন্যবহর পাটলিপুত্র নগরীতে প্রবেশ করল। ধ্রুবা বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁকে ঘিরে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে বটে, তবে সে বড়ই নিষ্প্রাণ, নির্জীব। পুরোহিতরা স্বস্তিবাচন করছেন, পুরনারীরা পুষ্পবর্ষণ করছেন। কিন্তু সবই যেন যান্ত্রিক, পুত্তলিবৎ। রাজ্যের ভাবী রাজমহিষী রাজধানীতে পদার্পণ করছেন, তাঁর স্বাগত অনুষ্ঠান এত বিবর্ণ কেন?

ধ্রুবা ভাবলেন কুমার কচকে কিছু জিগ্যেস করবেন। কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন তাঁদের কাছে একদল সৈন্য এসে উপস্থিত হল। কচ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে তাঁদের সঙ্গে কোথায় যেন গেলেন, ধ্রুবার দিকে ফিরেও তাকালেন না।

এইবার অমঙ্গল আশ আশঙ্কায় ধ্রুবার হৃদয় কম্পিত হতে লাগল। নারীজাতির সহজাত অন্তর্সংবেদনে বুঝলেন পরিস্থিতি অনুকূল নয়, সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়।

ধীরে ধীরে ধ্রুবার চতুর্দোলা প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী উঠে গেছে প্রাসাদের মূলদ্বার অবধি। সেখানে একদল সুবেশ নারী এবং পুরুষেরা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণ সোপান বেয়ে নেমে এলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'সন্তানের প্রণাম নেবেন মা। আমি গুপ্তসাম্রাজ্যের এক অধীনস্থ কর্মচারী। অধীনের নাম শিখরস্বামী।'

ধ্রুবার আশ্চর্যচকিত হলেন। শিখরস্বামী এই সুবিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতায় এবং প্রভাবে স্বয়ং সম্রাটের পরেই তাঁর স্থান। তাঁর কূটবুদ্ধি এবং রাজনীতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান প্রবাদপ্রতিম।

প্রধানমন্ত্রী শিখরস্বামীর আদেশে দুইজন পরিচারিকা এসে ধ্রুবার দুইপাশে দাঁড়াল। শিখরস্বামী বিনম্রস্বরে বললেন, 'আসুন রাজকুমারী। রাজমহিষী দত্তাদেবী আপনার অপেক্ষা করছেন।'

পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুবা চারিদিক দেখছিলেন। এমন সুরম্য হর্ম্য, এমন সুসজ্জিত প্রাসাদ ইতিপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। মালব রাজপ্রাসাদ এর তুলনায় পর্ণকুটির বললেই চলে। কী অতুল বৈভব, কী অপ্রমেয় ঐশ্বর্য!

একটু পরেই একটি সুবিশাল দরজা দিয়ে একটি অতি সুরম্য কক্ষে প্রবেশ করলেন ওঁরা। অতুলনীয় বৈভবে সাজানো সেই কক্ষ। তার মধ্যে একটি সিংহাসনের ওপর বসেছিলেন এক বৃদ্ধা রমণী। বয়স এবং সদ্য বৈধব্যবেশ তাঁর সৌন্দর্য এবং আভিজাত্যকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারেনি।

তাঁর দুইদিকে দুইজন যুবক দাঁড়িয়েছিলেন। আর তাঁদের একজনকে দেখে ধ্রুবার হৃৎস্পন্দন যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত!

অন্য কোনও সাধারণ নারী হয়তো ওখানেই বিস্ময় বা উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলতেন। কিন্তু ধ্রুবা নিজেও একজন রাজকন্যা। রাজশিষ্টাচার তাঁর মজ্জাগত। ঠোঁটদুটি একবার থরথর করে কেঁপে ওঠা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পেল না।

শিখরস্বামী মৃদুস্বরে বললেন, 'মহারানী দত্তাদেবী। প্রণাম করুন মা।'

ধ্রুবাদেবী এগিয়ে গিয়ে মহারাণীর চরণ স্পর্শ করতেই, তিনি দু-হাত দিয়ে ধ্রুবাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুমিষ্ট অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'সৌভাগ্যবতী ভব, কল্যাণী। গুপ্ত বংশের ভবিষ্যৎ মহারাণীকে, সমগ্র গুপ্ত সাম্রাজ্য ও পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগতম। গুপ্ত বংশের গৌরবকে তুমি বয়ে নিয়ে চলো, এই প্রার্থনা রাখি।'

আনন্দে ধ্রুবাদেবীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন সব মিথ্যে। অবশেষে তিনি তাঁর দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন। তিনি একবার তির্যক চাহনিতে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তর দিকে চাইলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তখন নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতো সামনে তাকিয়ে আছেন। তিনি যেন এই পৃথিবীতেই আর নেই।

দত্তাদেবী বলে চললেন, 'আমরা কুমার চন্দ্রগুপ্তর কাছ হতে তোমার ব্যাপারে সবকিছু অবগত হয়েছি কল্যাণী। কুমার কচ যে প্রতিশ্রুতি তোমার পিতাকে দিয়েছেন গুপ্তবংশ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।'

ধ্রুবা লজ্জাবিনতা হলেন।

'কুমার চন্দ্রগুপ্ত যখন মালবে অবস্থান করছিলেন, তখন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর শারীরিক অবস্থার আকস্মিক অবনতি হয়। আমরা সেই মর্মে দূত পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কুমার পাটলিপুত্র এসে পৌঁছবার পূর্বেই সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

ধ্রুবা মুখ তুলে তাকালেন। তখনও তিনি বুঝতে পারছেন না এই উক্তির মর্ম কী।

দত্তাদেবী বলে চললেন, 'সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর অবর্তমানে তাঁর সিংহাসনাভিষিক্ত হতে চলেছেন যুবরাজ রামগুপ্ত। তাই কুমার কচের তোমার পিতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তোমার ও রামগুপ্তর বিবাহ স্থিরীকৃত করেছি। আর আমি চাই যুবরাজ রামগুপ্তর রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই যেন এই বিবাহ অতি সত্বর সম্পাদিত হয়।'

ধ্রুবাকে দেখে মনে হল, এই কথাগুলির অর্থ তাঁর ঠিকমতো বোধগম্য হয়নি। অথবা তাঁর মস্তিষ্ক যেন শূন্য হয়ে গেছে। তাঁর উপর বজ্রাঘাত হয়েছে। তিনি বোধহয় কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখে কোনও স্বর

ফুটল না।

নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন ধ্রুবা, তিনি যা শুনলেন সে কি সত্যি? তিনি কি জেগে আছেন? স্বপ্ন দেখছেন না তো?

দত্তাদেবী আরও বলে চললেন, ‘কুমার চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র পৌঁছবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই সম্রাট স্বর্গারোহণ করেন। তাই গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারনীতি সূত্রে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এখন রামগুপ্ত। কুমার কচ তোমার পিতাকে কথা দিয়েছেন যে তুমি গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহিষী হবে। কুমারের অনুরোধ সম্রাটের অনুরোধের সমতুল্য। তাই গুপ্তসম্রাট রামগুপ্তর সঙ্গেই তোমার বিবাহ স্থির করেছি।

গুপ্তবংশের রীতি হচ্ছে সচরাচর কোনও অবিবাহিত সম্রাট সিংহাসনে আরোহন করেন না। সম্রাট রামগুপ্তর অভিষেক মহোৎসব অতি শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। তাই কালই তোমাদের বিবাহের দিন।’

চন্দ্রগুপ্ত মাথা নত করে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে জ্ঞান হারালেন ধ্রুবা। পড়েই যেতেন যদি না দুই সতর্ক পরিচারিকা তাঁকে ধরে ফেলত।

ধ্রুবাদেবী ও রামগুপ্তের বিবাহ সম্পন্ন হল পরের দিনই।

ধ্রুবা বাতায়নপথে নিষ্পলকে চেয়েছিলেন দূর আকাশের দিকে। মগধের আকাশে মেঘেদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। শুনেছেন এই গাঙ্গেয় উপত্যকার বৃষ্টিপাত নাকি ভয়ঙ্কর সুন্দর। মনে হয় যেন সারাদিন ধরে সমস্ত আকাশ তার ভারাক্রান্ত মনের করুণ বিষাদ ঢেলে চলেছে। সেই অবসন্ন বিষাদের রঙ ধূসর, শব্দ মৃত্যুর মতো নরম।

ধ্রুবাকে দেখলে মনে হয় যেন সমস্ত প্রাণের সাড়া, আনন্দের উচ্ছ্বাস সব অন্তর্হিত হয়েছে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক তিক্ত ঔদাসীন্য, কটু বিষাদের ছায়া। বিবাহের পর মানুষের মনে এক অপার্থিব আনন্দ ছেয়ে থাকে। একজন সম্পূর্ণ মানুষকে নিজের মতো করে পাওয়ার আশ্চর্য আনন্দ। একজন অন্য মানুষের কাছে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরার উন্মুখ আগ্রহ। তাকে আবিষ্কার করার উত্তেজনা, একটি নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

কিন্তু ধ্রুবার মন তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের প্রতি ঘৃণায়, তিক্ততায় বিষিয়ে গিয়েছে। বিবাহের পর একটি সপ্তাহ তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেননি, নবলব্ধ সখীদের সঙ্গে আলাপ করেননি, দর্শনপ্রার্থীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বিবাহের দিনই এই সুখবর জানিয়ে দূত যাত্রা করেছিল মালবদেশের উদ্দেশে। তিনি পত্র দিয়েছেন পিতার উদ্দেশে। তাতে কেবলমাত্র এই ক’টি বাক্য লেখা, ‘পিতা, আমি সুখে আছি। মন্দাকে জানিও, আমি সুখে আছি। তার কথা বড় মনে পড়ে।’ শেষ বাক্যের নীচে একফোঁটা জলের দাগ।

নববিবাহিতা ধ্রুবা, মালবরাজনন্দিনী ধ্রুবা সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসা আকাশের দিকে চেয়ে চোখ বুজলেন। নিজের বাসররাত্রির কথা ভেবে আবার বিবমিষা উদ্রেক হল তাঁর।

প্রতিটি নারী তাঁর স্বামীর সঙ্গে একান্তে পরিচিত হয় বাসরশয্যায়। সে চেনা শুধু শরীরী চেনা নয়, মনের সঙ্গে মনের মিলন আলাপের দিনও বটে। বাসর রাত আনন্দের রাত, শিহরনের রাত, সমর্পণের রাত। আর সেই রাত ধ্রুবার পায়ের কাছে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যখন রামগুপ্ত তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্ষুধার্ত পশুর মতো।

হায়, মালবরাজনন্দিনী ধ্রুবা! পিতার আদরের পুত্তলি ধ্রুবার ভাগ্যে এই অপমানও লেখা ছিল? বাসররাতেই স্বামীর দ্বারা সবলসম্ভোগ? চোখ বন্ধ করে ইষ্টদেবতা বিষ্ণুর কাছে বোধহয় এই অপমানেরই প্রতিকার চেয়েছিলেন তিনি। হে ভগবান, তুমি নাকি দুর্বলের সহায়? অনাথের নাথ? ভক্তের ডাকে নাকি

সাড়া না দিয়ে তুমি নাকি থাকতে পারো না? কুরুরাজসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর সহায় হয়েছিলে তুমি। আর আজ কি এই অসহায়া ধ্রুবার আহ্বানে সাড়া দেবে না?

ভগবান বিষ্ণু সাড়া দিলেন বটে, তবে বড় করুণ বিদ্রুপের মধ্যমে। রামগুপ্তর প্রাথমিক জান্তব প্রচেষ্টার পরেই সেই তিক্ত কটু সত্যটি ধ্রুবার কাছে প্রতিভাত হল।

রামগুপ্ত একজন ক্লীব। পৌরুষহীন, স্ত্রীসম্ভোগে অক্ষম।

ধ্রুবা নিজের সমস্ত পোশাক শয্যা থেকে একত্রিত করে হাতে তুলে নিলেন, তারপর রামগুপ্তের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, 'কেন? তবুও কেন চেয়েছিলেন আমাকে?'

রামগুপ্ত তাঁর দিকে কুটিল চোখে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। সেই হাসিতে কতটা অক্ষম ঈর্ষা, কতটা তিক্ত হতাশা লুকিয়ে আছে সে আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

পানপাত্রটি নিজের কাছে টেনে নিয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্বীতে একটি চুমুক দিয়ে রামগুপ্ত বলেন, 'জানো মহাদেবী, আমি যখন বালক ছিলাম, আমার প্রিয় ব্যসন কী ছিল? অন্য শিশুদের থেকে তাদের কন্দুক, ক্রীড়নক, পুত্তলি এসব বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া। আমার তো অর্থের অভাব ছিল না। অর্ধজম্বুদ্বীপাধিপতি সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আমার পিতা। রাজকোষ আমার জন্য সদাসর্বদা উন্মুক্ত। তবুও এসব করতে আমার ভালো লাগত। জানো তার কারণ কী?

'আনন্দ! অন্যের প্রার্থিত, কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছলে বলে কৌশলে অধিগত করার আনন্দ। যার কাছ থেকে তার ঈপ্সিত বস্তুটি ছিনিয়ে নিচ্ছি তার চোখে অসহায় আকুল আর্তি দেখার অদ্ভুত এক উচ্ছ্বাস আছে ধ্রুবা, সেই আনন্দের তুলনা নেই। সে কাঁদবে, আমার পায়ে লুটোবে, আমার কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর আমি তাকে উপেক্ষা করব, তার বড় ভালোবাসার বস্তুটিকে অবহেলায়, অশ্রদ্ধায় পথের ধুলায় ফেলে নষ্ট করব, এর থেকে বড় আনন্দ আমি জীবনে আর কিছুতে পাইনি।

'তুমি প্রশ্ন করতে পারো, আমি কি সেইসব ক্রীড়াসামগ্রী দিয়ে খেলতাম? উত্তর হচ্ছে না, কখনই না। আমার তো ক্রীড়ায় কোনও উৎসাহ নেই। আমার উৎসাহ তো সেই দুর্ভাগার অসহায় নিরুচ্চার ক্রন্দন শোনার মধ্যে। সেই কান্নার স্বর আমার প্রতি রোমকূপে এক উন্মাদ উদ্দীপনা সঞ্চার করত মহাদেবী। করত কেন বলছি, এখনও করে। তার তুল্য আবেশ আর কিছুতে পাই না ধ্রুবা, আর কিছুতে না।'

ধ্রুবা শান্তশীতলস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'ও, তার মানে এই সবই শুধু আমাকে চন্দ্রগুপ্তের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, তাই তো?'

রামগুপ্ত মাধ্বীর পাত্রে চুমুক দিয়ে হাসতে থাকেন। সেই কুটিল হাসিতেই ধ্রুবা তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন।

ধ্রুবার মধ্যে যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে রামগুপ্তের গলা টিপে ধরে বললেন, 'আজই প্রথম আর আজই শেষ মহারাজ। পুনরায় যেন আপনাকে আমার অন্তর্মহলে প্রবেশ করতে না দেখি। আর একবারও যদি আমাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা করেছেন তাহলে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব, এই আমার শেষ কথা।'

রামগুপ্ত তাঁর সবল বাহু দিয়ে ধ্রুবার হাতখানি নিজের কণ্ঠদেশ থেকে সরালেন। তারপর ধীরেসুস্থে নিজের পোষাক পরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। শুধু যাওয়ার আগে মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, 'তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, জনপ্রাণীর কাছেও আমার এই অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবে না। মনে রেখো তোমার বা তোমার প্রেমাস্পদের জীবনদীপ নির্বাপিত করা আমার কাছে এক মুহূর্তের খেলা।'

'মিত্র,

আশা করি ঈশ্বরের আশীর্বাদে কুশলে আছেন। অনুমান করি যে আপনার দিক থেকে সমস্ত পরিস্থিতি আমাদের পরিকল্পনার অনুকূলে।

মালব আক্রমণের অভিনয় যে অতি উত্তমভাবে পালিত হয়েছে, আশা করি সে সংবাদ যথাসময়েই প্রাপ্ত হয়েছেন। কুমার চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন হতে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা যে সফল হয়েছে সে সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এবার সময় এসেছে পরিকল্পনার মূল অংশ বাস্তবায়িত করার।

আমি গুপ্তচরসূত্রে কুমার চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে মালবের রাজকুমারী ধ্রুবার প্রণয়কাহিনি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত হয়েছি। রাজমাতা দত্তাদেবী কুমার রামগুপ্তর সঙ্গে ধ্রুবার বিবাহ নিষ্পন্ন করে নিজের অজান্তেই আমাদের মস্ত বড় উপকার করেছেন। আশা করি এতদ্দ্বারা কুমার চন্দ্রগুপ্ত এবং সম্রাট রামগুপ্তর মধ্যে চিরস্থায়ী বিরোধ এবং মনান্তরের পথ প্রশস্ত হবে। এবং তার ফলস্বরূপ গুপ্তসাম্রাজ্য ভিতর থেকে আরও দুর্বল হবে। বলবান পুরুষের যৌন ঈর্ষার থেকে বিধ্বংসী ক্রোধ আর দ্বিতীয়টি নেই। আর কুমার চন্দ্রগুপ্তর বীর্যবত্তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি স্বদেশের প্রতি বিরূপ হলে আমাদেরই সুবিধা।

মালব আক্রমণকালে আমি আরও একজনের পরাক্রম স্বচক্ষে দেখে বড় মুগ্ধ হয়েছি, তিনি হচ্ছেন রাজকুমারী ধ্রুবা। আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে এই অধম নারীপ্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দিতে সদাই উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই আপনার স্কন্ধে আরও একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। আমার ইচ্ছা গুপ্তসিংহাসনের সঙ্গে গুপ্তবংশের গৃহলক্ষ্মীও আমার করতলগত হোন। এবং এর জন্য উপযুক্ত মূল্য আপনি অবশ্যই পাবেন।

আপাতত এই আমার শেষ পত্র। গত মাসাধিককালের মধ্যে আমাদের অন্তত তিনজন অতি বিশ্বস্ত এবং উচ্চপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর পাটলিপুত্রে ধৃত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দণ্ডপাশিক নাগদত্ত এবং মহাপ্রতিহার রুদ্রদেব দুইজনেই কুমার চন্দ্রগুপ্তর বিশেষ অনুগত। তাই আমি আর আপনার কাছে কোনও সংবাদ প্রেরণ করব না। আপনি কেবলমাত্র আপনার মূল পরিকল্পনাটি আমাকে প্রেরণ করবেন। আর সেটি প্রেরণ করবেন যে সঙ্গীটিকে আপনার হাতে দিয়েছি, তার মাধ্যমে। সংবাদ প্রেরণের উপায়ও সেইই আপনাকে বলে দেবে।

আপনার জনৈক কুশলাকাঙখী।'

পত্রটি পড়ে ধীরে ধীরে নিজের দীপাদানের দিকে নিয়ে গেলেন মানুষটি। তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একটি দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। পত্রটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হলে তিনি সংবাদবাহকের দিকে ফিরে তাকালেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'শাস্ত্রপাঠ করেছ বাছা? রথস্থং বামনং দৃষ্টা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, কথাটা শুনেছ? না শুনে থাকলে শুনে নাও। পাটলিপুত্রবাসী আশু সেই মহাপুণ্যের অংশভাক হবে। যাও, যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করো।'

সংবাদবাহকের মুখখানি অমল হাসিতে ভরে গেল। মূক ও বধির মানুষটি কিছুই বুঝল না বটে, তবে এবার কী করতে হবে সে বিষয়ে সে উত্তমরূপে অবগত আছে। সে ধীরেসুস্থে একটি ভীষণদর্শন কুশাগ্রধার শস্ত্রী বার করল নিজের বস্ত্রাবরণ থেকে।

রামগুপ্ত আর ধ্রুবার অন্তর্মহলে এলেন না বটে তবে মহাদেবী ধ্রুবার বেঁচে থাকা আরও করুণ হয়ে উঠল। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাজাধিরাজ রামগুপ্তের মহাদেবী হওয়ার দুর্ভোগ নেমে এল তাঁর জীবনে। ধ্রুবা বুঝতে পারলেন তিনি নামেই এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, আসলে তাঁর অবস্থা পাটলিপুত্রের এক সাধারণ মালিনী বা নাপিতিনীর থেকেও অধম। তাঁর কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। তাঁর মহলের প্রতিটি দাসী, প্রতিটি পরিচারিকা, প্রতিটি রক্ষী প্রকৃতপক্ষে রামগুপ্ত নিয়োজিত গুপ্তচর। গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহিষী ধ্রুবার প্রতিটি পল কে যেন অদৃশ্য থেকে নিরীক্ষণ করে। যেন তাঁর কোনও স্বাধীন সত্তা নেই, ইচ্ছা নেই, নিজস্ব মুহূর্ত যাপনের অধিকার নেই।

ধ্রুবা দিনদিন নিজেকে আরও সঙ্কুচিত করে নিলেন। তিনি জনসমক্ষে মহাদেবীর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে চললেন বটে, কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে ক্ষয়ে যেতে লাগলেন।

এদিকে রামগুপ্তর প্রতিটি দিন নর্তকী ও স্তাবক সমভিব্যাহারে পানাহারে মত্তযাপিত হতে থাকল। সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্য চালনার কোনও যোগ্যতা রামগুপ্তের ছিল না। একথা পাটলিপুত্রের রাজসভার প্রতিটি সভাসদ জানতেন। মগধের প্রতিটি সুনাগরিক জানতেন। এমনকী দত্তাদেবীও জানতেন। কিন্তু কারও কিছু বলার উপায় ছিল না।

রামগুপ্ত সভায় আসেন চূড়ান্ত মদ্যপ অবস্থায়। সম্মানিত সভাসদদের সঙ্গে ইতরজনোচিত ব্যবহার করেন। নিজেরই চটুল এবং অশ্লীল রসিকতায় হো হো করে হাসতে থাকেন। আর সেই হাসিতে কেউ যোগ না দিলে তার জন্য তৎক্ষণাৎ কোনও কঠিন দণ্ডবিধান করেন। প্রিয় মিথ্যায় দ্রুত বিগলিত হন। উপকারী অথচ অপ্রিয় সত্য কথা বললে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মানীকে অনায়াসে অবহেলা করেন। গুণীকে অসম্মান।

পাটলিপুত্র রাজসভায় সবার অলক্ষ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগল।

কিন্তু ক্ষমতার মদে মত্ত রামগুপ্ত সেসব গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি তখন নিজের গৌরব প্রচারে অন্ধ। মহামাত্য এবং সান্ধিবিগ্রহিকরা আদেশপ্রাপ্ত হলেন তাঁর গৌরবগাথা শিলালিপিতে খোদিত করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠার জন্য। নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করলেন তিনি। দূরদেশে নিজের গৌরবগাথা প্রচারিত করার জন্য নিয়োগ করলেন সংবাদবাহক। নিজ মূর্তি স্থাপন করলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আর অনুগত স্তাবকের দল তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রবলবেগে শিরশ্চালন করে, সাধু সাধু রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

এই স্তাবকমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন শিখরস্বামীর পুত্র সূর্যস্বামী। শাস্ত্রে বলে যোগ্যং যোগ্যেন যোজ্যয়েৎ। শাস্ত্রবচনের এর থেকে উত্তম উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি হয় না। সম্রাট রামগুপ্ত যদি বলেন সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত হন, সূর্যস্বামী ঘাড় নেড়ে বিজ্ঞের মতো বলেন, ‘তাই তো, এ তো আমরা লক্ষ্য করে দেখিনি। সম্রাট যখন বলছেন তখন সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত না হয়ে যান কোথায়?’ সম্রাট যদি বর্ষার প্রবল ধারাপাতের মধ্যে বলেন, ‘ওহে সূর্যস্বামী, দেখেছ, আজ চারদিক কী শুষ্ক, আবহাওয়া কী মনোরম, মলয়পবন কী অনুপম,’ তাহলে সূর্যস্বামী বলেন, ‘অহো, ধরিত্রীর কী সৌভাগ্য! পশ্য পশ্য, সম্রাটের আদেশে আজ পাটলিপুত্রের আকাশে-বাতাসে অকাল বসন্ত।’

অবশেষে একদিন এই নিঃসংশয়, নির্বাধ এবং নির্লজ্জ কৈতববাদের অভিপ্রেত ফল ফললো।

গুপ্তসৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সেনাপ্রধান দনুজদমন। রামগুপ্তর রাজ্যাভিষেকের অনতিকালের মধ্যেই এক অপদার্থ এবং অযোগ্য সম্রাটের কুশাসনের সমস্ত লক্ষণ বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের শরীর জুড়ে পরিস্ফুট হতে লাগল। দিকে দিকে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে একদিন বিদ্রোহের আকার ধারণ করল। রামগুপ্ত অবাধ্যতা পছন্দ করেন না। তিনি সৈনিকদের নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমনের আদেশ দিলেন।

গুপ্তসৈন্যবাহিনী শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে পটু। অস্ত্রহীন স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে তারা অভ্যস্ত নয়। তাদের অসন্তোষ দনুজদমন অবধি পৌঁছল। তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।

'বলপ্রয়োগে অযথা বিপত্তি বৃদ্ধি পায় সম্রাট। প্রজাদের কাছে সম্রাট পিতৃতুল্য। আপনি যদি একবার বিক্ষুব্ধদের অন্তরের কথা শোনেন, তাহলে অনর্থক লোকক্ষয় এড়ানো সম্ভব।'

রামগুপ্ত সর্বদাই মদ্যপান করতেন। তিনি এক চুমুকে স্বর্ণভৃঙ্গারটি শূন্য করে গম্ভীরমুখে বললেন, 'কোন বলপ্রয়োগ অযথা, আর কোনটি যথাযথ, সে সিদ্ধান্ত কে নেবেন সেনাপতি?'

দনুজদমন নম্রভাবে বললেন, 'অবশ্যই আপনি নেবেন প্রভু। আপনি সম্রাট, আমি আপনার বেতনভোগী অন্নদাস। কিন্তু আমি আজীবন গুপ্তসাম্রাজ্যের সেবা করেছি প্রভু। আমার বুদ্ধিবিবেচনার ওপর প্রয়াত সম্রাটও কম আস্থা রাখতেন না। আমার অনুরোধ যদি শোনেন তাহলে আপনার উপকার বৈ অপকার হবে না মহারাজাধিরাজ।'

প্রবীণ সেনাপ্রধানকে ধমকে উঠলেন রামগুপ্ত, 'ভুলে যাবেন না সেনাপতি, আমি গুপ্তবংশের সম্রাট, এই সসাগরা জম্বুদ্বীপে স্বয়ং ঈশ্বরের পরেই আমার স্থান। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা আপনাকে কে দিয়েছে?'

আরও বিনত হলেন দনুজদমন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য প্রভু। কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্যের একজন প্রবীণ সেবক তাঁর সম্রাটের কাছে অনুরোধ করছে যদি অন্য কোনও উপায়ে, লোকক্ষয় এড়িয়ে, গুপ্তসাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা হয়।'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঝলসে উঠল রামগুপ্তর স্বরে, 'প্রবীণ সেনাপতির বুদ্ধিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রবীণ হয়েছে মনে হয়। তাঁর বোধহয় কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপাতত আপনি বিশ্রামে যান দনুজদমন। আপনার পরিবর্তে আজ থেকে সূর্যস্বামীই সৈন্যাধ্যক্ষর দায়িত্ব পালন করবেন।'

দনুজদমন একবার আহত চোখে সম্রাটের দিকে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না। তারপর কোষবদ্ধ অসি এবং শিরস্ত্রান সম্রাটের পদতলে রেখে চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চল। প্রস্তরবৎ। তাঁর মুখে বিন্দুমাত্র রেখাপাত ঘটল না। কুমার কচগুপ্ত বিচলিত হলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠকে দেখে সংযত করলেন নিজেকে।

সভাস্থলে উপস্থিত কয়েকজনের হনুদেশ কঠিন হল। গুপ্তবংশের ভাগ্যলক্ষ্মী ব্যতীত কেউ তা লক্ষ্য করলেন না।

সূর্যস্বামী সেনাপ্রধান পদে বৃত হওয়ার কয়েকমাস পরের কথা। বর্ষারানি বিদায় নিয়েছেন। পাটলিপুত্রের আকাশে বাতাসে শরৎকুমারীর উচ্ছল আগমনধ্বনি। পয়োধরা কাদম্বিনীর অঞ্চলপ্রান্ত থেকে উঁকি দিয়ে যায় ভাদ্রের আলোকপুষ্পশর। পাটলিপুত্রের কর্দম পথগুলি শুষ্ক হতে শুরু করেছে। শেফালী, গগনশিরীষ এবং পান্থপাদপের ফুলে ঢেকে গিয়েছে মগধের বীথি ও বনতল। সুরধুনী গঙ্গা বয়ে গিয়েছেন পাটলিপুত্রের বক্ষ ছুঁয়ে। তাঁর পলিবিধৌত তীরভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কুশফুলের শুভ্র গুচ্ছরাশি।

রাজসভাসদরা পাটলিপুত্রের রাজসভা আলো করে বসে আছেন। তাঁরা মৃদুস্বরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। এমন সময় প্রতিহারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করল যে সম্রাট রামগুপ্ত পদার্পণ করছেন।

সভাসদরা ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধা শুধু সম্মান থেকে নয়, ভয় হতেও উৎপন্ন হয়।

রামগুপ্ত সিংহাসনে আসীন হয়েই প্রসন্ন স্বরে বললেন, 'আজকের আবহাওয়া বড় উত্তম। রাজপণ্ডিত, এমত মনোরম পরিবেশে সম্রাটের কর্তব্যকর্ম নিয়ে শাস্ত্রে কিছু লেখা আছে নাকি?'

প্রৌঢ় রাজপণ্ডিত গজাননমিশ্র বড়ই দুর্বলচিত্ত পুরুষ। অস্থিরচিত্ত মদ্যপ সম্রাটের ইতর কৌতুক এবং মুখরা গৃহিণীর সম্মার্জনীর মাঝে তিনি পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মতো টলায়মান থাকেন। তদুপরি তাঁর গৃহে চারিটি অনূঢ়া কন্যা বিদ্যমান। তিনি দ্রুত স্বরে বলে উঠলেন, 'আছে বৈ কি সম্রাট। প্রাচীনকালে এই সময়েই বলবান সম্রাটরা দিগ্বিজয়ে বেরোতেন। আমার মনে হয় আপনারও এবার দিগ্বিজয়ের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

সভাসদদের মধ্যে অনেকেই শিহরিত হলেন। গজাননমিশ্রর কাণ্ডজ্ঞান বা তার অপ্রতুলতা বিষয়ে অনেকের মনেই অনেকদিন ধরে সন্দেহ ছিল। আজ তাঁরা নিঃসন্দেহ হলেন। বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদ না হলে কেউ লুব্ধ শৃগালকে ভগ্ন উদ্যানবেষ্টনী দেখায় না!

অতি উৎকৃষ্ট গৌড়ী দ্বারা স্বহস্তে নিজ ভৃঙ্গারটি পূর্ণ করতে করতে সম্রাট প্রশ্ন করলেন, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু যেসব রাজ্য অধিগত করার ছিল সেসবই তো পিতা জয় করে বা করভারে অধীনস্থ করে রেখে গেছেন। মালবের মতো কিছু নপুংসক রাজ্য তো নিজেদের বিক্রয়ই করে দিয়েছে আমাদের কাছে। জয় করবার জন্য আর রয়েছেটাই বা কী?'

ক্ষমতাবান, বিজিগীষু এবং অপদার্থ পুরুষেরা সচরাচর লক্ষ করেন না যে তাঁদের কোন বাক্য কাকে কোথায় কীভাবে আহত করে। সম্রাটের উক্তি শুনে চন্দ্রগুপ্তর মুখ কঠিন এবং গম্ভীর হল। কচগুপ্ত সেদিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

গজাননমিশ্র এসবের কিছুই বুঝলেন না। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কথা সত্য বটে। সমগ্র জম্বুদ্বীপই তো সম্রাটের অধীন। তবে শুনেছি যে উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে নাকি বর্বর শকদের আধিপত্য এখনও বিদ্যমান। আমার মনে হয় সম্রাটের উচিত তাদের দমন করে উত্তর পশ্চিম জম্বুদীপের অধিকার স্বহস্তে নেওয়া।'

রামগুপ্ত ভ্রূকুটি করে বললেন, 'বটে?'

গজাননমিশ্র উৎসাহ পেলেন। 'সে আর বলতে! আর জনশ্রুতি এই যে ওই অঞ্চলে নাকি ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠতম গঞ্জিকার চাষ হয়।'

রামগুপ্তর মুখমণ্ডল অমল প্রসন্নতায় ভরে গেল। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমার বিজয়যাত্রার শিবির তাহলে এবার উত্তর পশ্চিমেই স্থাপিত হোক। আর হ্যাঁ, আমার আদেশ, আমার সমস্ত পারিষদ, সভাসদবর্গ এবং তাঁদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যেন এই বিজয় যাত্রার অংশীদার হয়, যাতে, প্রত্যেকে স্বচক্ষে আমার এই শকবিজয়যাত্রার সাক্ষী থাকতে পারেন। এই আদেশের যেন অন্যথা না হয়।'

বিজয় যাত্রা শুরু হওয়ার আগের দিনের কথা। অন্যদিনের মতো এইদিনও ধ্রুবা বসেছিলেন বাতায়নের পাশে। নিষ্পলকে চেয়েছিলেন দিগন্তের দিকে। এত কর্মব্যস্ততা, এত কোলাহলমুখরতা, কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করছিল না। স্বয়ং মহাদেবীও এই অভিযানে সম্রাটের সঙ্গী হবেন, মহাপরাক্রান্ত রাজাধিরাজ রামগুপ্তর এই ইচ্ছে। তাঁরও যাত্রাপ্রস্তুতি সম্পূর্ণপ্রায়।

একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলেন, 'মহাদেবী, কুমার কচ আপনার দর্শনাভিলাষী।'

ধ্রুবা সচকিত হলেন। যে ধ্রুবা কুমার কচের সঙ্গে প্রথমবার আলাপিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন মালবসাম্রাজ্যের স্বাধীন রাজকুমারী। এখন তিনি মহামহিম গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাদেবী, রাজ্ঞী ধ্রুবস্বামিনী। তাঁকে তাঁর নিজের ভ্রাতার সঙ্গে আলাপিত হওয়ার জন্যেও প্রস্তুতি নিতে হবে বৈ কি!

কুমার কচ প্রবেশ করলেন। পরিচারিকারা তখনও দণ্ডায়মান।

ধ্রুবা পরিচারিকাদের আদেশ করলেন, 'তোমরা কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করো।'

পরিচারিকারা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এবার ধ্রুবার ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি ধমকে উঠলেন, ‘কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না? যাও, কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করো। আমি আদেশ না দেওয়া অবধি যে এই কক্ষে প্রবেশ করবে, কালই তাকে শূলে দেব।’

পরিচারিকারা সভয়ে কক্ষত্যাগ করলেন। দ্বার বন্ধ হওয়ার পর কুমার কচ অস্বস্তিজড়িত স্বরে বললেন, ‘গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিশ্বরী মহাদেবী ধ্রুবাকে কুমার কচের প্রণাম। কুমার চন্দ্রগুপ্ত আপনার সুস্বাস্থ্যের কামনা করেন। তিনি জানতে চেয়েছেন আপনি এখন কেমন আছেন দেবী?’

এক মুহূর্তের জন্য ধ্রুবার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সুতিক্ত হাসি ফুটে উঠল তাঁর অধরে। শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, ‘আমার বিষয়ে কুমারকে চিন্তা করতে বারণ করুন কুমার কচ। তাঁর কাছে বোধহয় আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।’

বলতে বলতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, ধীরস্বরে বললেন, ‘আর হ্যাঁ, আপনি যদি মহারাজাধিরাজের গুপ্তচর হন, তাহলে তাঁকে জানিয়ে দিন যে তার আর প্রয়োজন নেই। যে ধ্রুবা অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই রাজপ্রাসাদে পা রেখেছিল, সে অনেক আগেই মৃত। এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঘাত তার হৃদয়ে আর আলোড়ন তোলে না।’

কচগুপ্তর মুখে ব্যথার বিস্ময় ফুটে উঠল, ‘কী বলছেন মহাদেবী? আমি মহারাজাধিরাজের চর? এ কথা আপনি বলতে পারলেন? আমি গুপ্তবংশের মহাদেবী, বংশের জ্যেষ্ঠা বধূরানির ওপর চরবৃত্তি করব? ক্ষমা করবেন মহাদেবী, এমন নীচ মন আমার এখনও হয়নি দেবী। মহারাজ রামগুপ্ত এবং কুমার চন্দ্রগুপ্ত, দুজনেই আমার অগ্রজ। তাঁদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে কী মনান্তর বা মতান্তর হয়েছে সে আমি জানি না, জানতেও চাই না। আমি গুপ্তসিংহাসনের প্রতি অনুগত। কিন্তু আমাকে কেউ এই রাজনৈতিক কূটকচাল, এই কলহাবর্তের মধ্যে টেনে আনুক, সে আমার অভিপ্রায় নয়।’

বলতে বলতেই ফিরে যাওয়ার জন্য পিছন ফেরেন কুমার কচ, ‘হ্যাঁ, আরও একটা কথা। আমাকে ভরসা করতে পারেন, মহাদেবী। আমি আপনার মিত্র। এবং কুমার চন্দ্রগুপ্তও। তিনি স্বয়ং বলে পাঠিয়েছেন এই কথা।’

কুমার কচকে যতদূর দেখা গেল ততদূর চেয়ে রইলেন মহাদেবী ধ্রুবা। তারপর অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর শয্যায়।

সভাসদ, পাত্র-মিত্র-অমাত্য সমভিব্যাহারে মহারাজ রামগুপ্তর বিজয়যাত্রা চলেছে। চলেছে উত্তরাপথের দিকে। চলেছে নগর, গ্রাম, অরণ্যানী স্রোতস্বিনী প্রকম্পিত করে। দরিদ্র, করভারপীড়িত প্রজাপুঞ্জ সেই গর্বোদ্ধত বিজয়শোভাযাত্রার দিকে সভয়ে চেয়ে থাকে, আর যাত্রাদল অন্তর্হিত হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ‘অহো, কী প্রতাপ!’

শোভাযাত্রার একদম প্রথম দিকে রয়েছে সম্রাট এবং তাঁর পারিষদবর্গের শিবিকা। আড়ম্বরে, পারিপাট্যে, গৌরবে সুসজ্জিত তারা। তাদের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। মধ্যস্থলের শিবিকাগুলি মহাদেবী, রাজমাতা সহ অন্যান্য পুরনারীদের জন্য। আর শোভাযাত্রার একদম শেষে সবচাইতে ক্ষুদ্র, অনাড়ম্বর এবং বাহুল্যবর্জিত শিবিকাটি নির্দিষ্ট হয়েছে কুমার চন্দ্রগুপ্তর জন্য।

মহাদেবী ধ্রুবার চতুর্দোলার ঠিক পরেই থাকে রাজমাতা দত্তাদেবীর চতুর্দোলা। ধ্রুবা প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গেই বাক্যালাপে বিশেষ উৎসাহী নন। তিনি জানেন যে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি চলাফেরা দত্তাদেবী বা সম্রাটের লক্ষ্যবন্দী। তিনি জানেন যে পরিচারিকাদের সামনে কোনও অসতর্ক মুহূর্ত, কোনও আপত্তিকর উক্তি

তাঁর জীবনে বৃহত্তর দুর্ভোগ এনে দিতে পারে। আর রাজমাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শীতল বললে কম বলা হয়।

এদিকে রাজস্কন্ধাবারের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে অন্য সমীকরণ। রামগুপ্ত প্রায় সারাদিনই মদ্যপানে রত থাকেন। তাঁর ঘটমান অবর্তমানে শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন সেনাপতি সূর্যস্বামী। তাঁর কথাই এখন রাজস্কন্ধাবারের শেষ কথা। তিনি যা পরামর্শ দেন, সম্রাট তাতেই সায় দেন। তিনি যে পথে যেতে বলেন, সম্রাট সেই পথেই হাঁটেন।

অযোগ্য পুরুষের হাতে ক্ষমতার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলে যা হয় তাই হতে লাগল। সূর্যস্বামী ক্ষমতার দম্ভে অন্যান্য পারিষদদের, এমনকী নিজের পিতা প্রধানমন্ত্রী শিখরস্বামীকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করলেন। প্রৌঢ় শিখরস্বামী সবার অজানিতে শুধু নিজশিরে করাঘাত করেন আর ভাবেন কোন পাপে এই অর্বাচীনের পিতা হওয়ার দুর্ভাগ্য হল তাঁর।

যাত্রার শুরুর দিন থেকে রামগুপ্ত আরও উদ্ধত, আরও দুর্বিনীত, আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে কুমার চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁর দুচক্ষের বিষ। তিনি প্রতিনিয়ত সর্বসমক্ষে চন্দ্রগুপ্তকে হেয় করেন, অপমান করেন। অহোরাত্র তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের একজন বেতনভুক কর্মচারী বৈ আর কেউ নন। আর তাতে ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়ে যান সূর্যস্বামী।

সূর্যস্বামী পরশ্রীকাতর, ভীরু, এবং কুটিল। এবং যে কোনও পরশ্রীকাতর, ভীরু এবং কুটিল পুরুষ সর্বদাই কোনও প্রতিভাবান ও স্বাবলম্বী পুরুষকে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা করে। সূর্যস্বামী চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত ভয় করতেন। এবং তার সঙ্গে অনেকটা ঈর্ষাও মিশে ছিল। তিনি জানতেন তাঁর গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠার পথে একজনই বাধা হতে পারেন, কুমার চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে সম্রাটকে কুমার চন্দ্রগুপ্তর প্রতি আরও বিদ্বিষ্ট করে তুললেন।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বড় স্থিরবুদ্ধির মেয়ে নন। উগ্র দম্ভ, কুটিল ঈর্ষা এসব তাঁর রুচিবিহর্গিত। তিনি ঈষৎ চঞ্চলা হলেন।

পাটলিপুত্র থেকে বারাণসীর পথে সাকেত পৌঁছেছে রাজশোভাযাত্রা। অনতিদূরে কান্যকুব্জ। নির্মল শারদপ্রভাত, বর্ষাবসানে তরুণ মেঘগুলি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে নবনীখণ্ডের মতো।

রামগুপ্ত শিবিকা থেকে বেরিয়ে রথারূঢ় হয়েছেন। পরনে সযত্নে পরিহিত রাজবেশ। এই প্রভাতেই ঈষৎ টলায়মান তিনি। চোখদুটি ঢুলুঢুলু। ঠোঁটদুটি ঈষৎ শিথিল। ওষ্ঠপ্রান্তে একটি দুর্বোধ্য হাসি। রামগুপ্তর পাশে আছেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সেনাপ্রধান সূর্যস্বামী।

পথপার্শ্বে প্রজাদের ভিড়। আজ মহারাজাধিরাজ দর্শন দেবেন শুনে তারা রাজসন্দর্শনে এসেছে। কে না জানে, রাজদর্শনে তীর্থযাত্রার সমান পুণ্যফল? ভীত, ক্লিষ্ট, দারিদ্র্যপীড়িত ভাগ্যহত প্রজাদের দল ভীতসমস্ত ভাবে পথের পাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাটের রথের চূড়া দেখামাত্র তাঁরা ধুলায় লুটিয়ে প্রণাম জানাতে লাগল মহাপরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের মহিমান্বিত সম্রাট রামগুপ্তর উদ্দেশে।

রামগুপ্ত বড় প্রসন্ন হলেন। আহা, এই তো চেয়েছিলেন তিনি। নিঃশঙ্ক, নিঃসপত্ন আনুগত্য। প্রজারা তাঁকে ভয় করবে, পারিষদবর্গ থাকবে অনুগত। আর তিনি রাজলক্ষ্মীর বরমাল্যটি নিজগলে ধারণ করে প্রবলপ্রতাপে সসাগরা ধরিত্রীর রাজচক্রবর্তী সম্রাট হয়ে বিরাজ করবেন। আহা, মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবাঃ...

একটু পরেই প্রজাদের মধ্যে কী যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা ইতিউতি তাকাচ্ছে, একে অন্যের কানে ফিসফিস করে কথা বলছে। যেন রাজসন্দর্শনের মতো মহাপুণ্যকর্মে তাদের আর মতি নেই।

রামগুপ্ত বুঝলেন না তাদের এই চঞ্চলতা কীসের। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে সূর্যস্বামীকে প্রশ্ন করতে যাবেন, এমন সময় একটি বেগবান অশ্ব ধূলি উড়িয়ে রামগুপ্তর রথের পাশে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের মধ্য

থেকে গগনবিদারী জয়ধ্বনি উত্থিত হল, 'জয় কুমার চন্দ্রগুপ্তর জয়। জয় গুপ্তসাম্রাজ্যের জয়। জয় ভারতভাগ্যবিধাতার জয়।'

রামগুপ্ত তাকিয়ে দেখলেন তাঁর রথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। সূর্যের আলো তাঁর বর্মে প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। তাঁর ঋজু শরীরে, উন্নত ললাটে, উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হচ্ছে রাজোচিত গাম্ভীর্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় অন্যান্য রাজন্যবর্গকে নিতান্তই নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

রামগুপ্তর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি গম্ভীরমুখে সারথিতে আদেশ দিলেন দ্রুত রথচালনা করতে।

অন্য একটি শিবিকায় আরও একজনের মুখও অরুণবর্ণ ধারণ করল বটে, তবে ক্রোধে নয়। কেন, কেউ জানে না। তিনি অতি নিভৃতে নিজের চোখ থেকে ঝরে পড়া দুই ফোঁটা মুকুতাবিন্দু মুছে নিলেন। সেই বিন্দুর মধ্যে কতখানি আনন্দ আর কতখানি বেদনা মিশে ছিল সে শুধু ঈশ্বরই জানেন।

পত্রটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সেইদিকে ভ্রুকুটিকুটিল চোখে চেয়ে রইলেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি। রাজসভা শূন্য। সভাসদদের রাজকার্য হতে অনেক আগেই অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি। তিনি ছাড়া এই রাজসভায় উপস্থিত কেবলমাত্র বীজনকার।

একটু পর প্রতিহারী এসে বিনম্রস্বরে বলল, 'কুমারী মন্দা উপস্থিত হয়েছেন প্রভু। তাঁকে অন্দরে আসতে বলি?'

মহারাজ অনুমতি দিলে মন্দা এসে আভূমি প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তিনি মহারাজের বয়স্য দন্তিদুর্গের কন্যা। স্বরাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে দন্তিদুর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগতি প্রাপ্ত হন। মন্দার মাতৃদেবী পরাশর সংহিতার বিধিবলে পুনর্বিবাহ করেন। সেই বিবাহে মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। এবং মন্দাকে দত্তক নেন।

সেই হতে মন্দা এই রাজগৃহে রাজকুমারীর সমান যত্নে পালিতা। মহারাজ মন্দা আর ধ্রুবাকে কোনওদিন পৃথকচক্ষে দেখেননি।

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি ধ্রুবাকে দেখে স্নেহস্বরে বললেন, 'কেমন আছ মা মন্দা। তোমার মাতৃদেবী কেমন আছেন?'

মন্দা শুষ্কস্বরে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে ভালো আছি মহারাজ। মা'ও ভালো আছেন।'

মন্দার নিষ্প্রাণ স্বর মহারাজের কান এড়াল না। তিনি পত্রটি মন্দার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধ্রুবার পত্র এসেছে মন্দা। তাই তোমাকে ডাকলাম। দেখ দেখি, পত্রটি পড়ে কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

মন্দা সাগ্রহে এগিয়ে এসে পত্রটি নিলেন। তারপর পত্রটি যে কতবার পড়লেন, কতবার গণ্ডদেশে স্পর্শ করে দেখলেন, কতবার তার সুগন্ধ নিলেন তার ইয়ত্তা নেই। কে জানত, এইভাবেও প্রাণাধিক প্রিয়সখীর স্পর্শ অনুভব করা যায়?

মহারাজ দুই সখীর প্রণয় সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁর চোখ দুখানি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তিনিও কি কন্যাবিরহে এমনই কাতর নন?

কিছুক্ষণ পর মন্দা কিঞ্চিৎ সুস্থির হলে মহারাজ কোমলস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলে মা মন্দা?'

মন্দা অশ্রুগোপন করে বললেন, 'ধ্রুবা ভালো আছে মহারাজ। মহান গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহিষী হয়ে সে সুখে আছে।'

'আর কুমার চন্দ্রগুপ্ত?'

এইবার মন্দার চোখের জল আর শিষ্টাচারের বাধা মানল না। তাঁর দুচোখ উপচিয়ে, কপোলতল বেয়ে অনেকদিনের সঞ্চিত কষ্টের স্রোত নেমে আসতে লাগল। তিনি শুধু অস্ফুটে একবার বললেন, 'কেবল ভালো মানুষদের সঙ্গেই কেন এমন হয় জ্যেঠ?'

মন্দা বালিকাবয়সে মহারাজকে নিজের আপন জ্যেষ্ঠপিতৃব্যরূপেই চিনতেন। বয়সকালে প্রাপ্ত শিষ্টশিক্ষা অনুযায়ী তিনি তাঁর পিতৃব্যকে মহারাজ সম্বোধনে অভ্যস্ত হলেও এই আবেগমথিত কালে সেই শিক্ষা আর তাঁর মনে রইল না।

অশ্রুমোচন করলেন মহারাজ চন্দ্রজ্যোতিও। কে বলে পুরুষ মানুষ কাঁদে না?

কিছুক্ষণ পর মহারাজ স্থির হয়ে বললেন, 'ধ্রুবা ভালো নেই রে, মা মন্দা।'

'কেন এ কথা বলছেন জ্যেঠ?'

'পত্রটি ভালো করে দেখ রে মা। নীচের দিকে জলবিন্দুর ছাপ দেখতে পাচ্ছিস?'

মন্দা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পত্রটি লক্ষ করলেন। তারপর সন্ধান পেলেন প্রায় মিলিয়ে আসা সেই অশ্রুবিন্দুছাপের।

বিষণ্ণ হাসলেন মহারাজ, 'কন্যার অশ্রুর চিহ্ন পিতার থেকে ভালো আর কেই বা চেনে রে মা?'

মন্দা স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। দুঃখে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'হিমবন্ত।'

বীজনকার ব্যজন বন্ধ করে বললেন, 'আদেশ প্রভু।'

'রামগুপ্তর ওই বিজয়শোভাযাত্রা না কী, তার কী সংবাদ?'

'প্রভু, আমার কাছে সংবাদ আছে যে সম্রাট রামগুপ্তর বিজয়শোভাযাত্রা ত্রিগর্তর পথে নগরকোটে পৌঁছবে।'

ভ্রুকুঞ্চন করলেন মহারাজা, 'আর নগরকোট হতে রুদ্রসিংহের ভীমনগর দুর্গ কতদূর?'

'অনধিক বিশ ক্রোশ, মহারাজ।'

'তাহলে রামগুপ্ত তার সভাসদ, কলত্র, পরিজন, সবাইকে নিয়ে শত্রুদুর্গের দিকে যাচ্ছে ঠিক কোন উদ্দেশে?'

'তিনি যাচ্ছেন না মহারাজ, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'বটে? আর তাঁকে ওই শত্রুপরিবেষ্টিত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার ছল তিনি বুঝতে পারছেন না কেন?'

'কারণ তিনি মূর্খ, মহারাজ। দাম্ভিক, অবিবেচক এবং মহামূর্খ।'

মন্দা চমৎকৃত হয়ে এই বার্তালাপ শুনছিলেন। এবার প্রশ্ন না করে পারলেন না, 'ইনি কে মহারাজ? ইতি এত সংবাদ পেলেন কোথা থেকে?'

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি স্নেহসিক্ত সুরে বললেন, 'এর নাম হিমবন্ত মা, পাটলিপুত্রের গুপ্তচর বাহিনীর অন্যতম প্রধান। রামগুপ্তর প্রিয় সেনাপ্রধান সূর্যস্বামী একে পাঠিয়েছিল আমার ওপর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। বেচারি প্রথম রাত্রেই ধরা পড়ে যায়। সেইদিনই এর শিরশ্ছেদ নিশ্চিত ছিল, যদি না আমি একে প্রাণভিক্ষা দিতাম।

সেই হতে হিমবন্ত আমার ভারি অনুগত হয়ে পড়েছে। সে পাটলিপুত্রের সঠিক সংবাদ আমাকে দেয়, আর মালবের বেঠিক সংবাদ পাটলিপুত্রে প্রেরণ করে। কী হিমবন্ত, ঠিক বলছি তো?'

হিমবন্ত আভূমি প্রণত হয়ে বলে, 'মহারাজের অশেষ কৃপা।'

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি বললেন, 'আমাকে যেতে হবে মা মন্দা। আমার মন বলছে মেয়ের সামনে বিপদ আসতে চলেছে, ভয়ংকর বিপদ।'

মন্দা চোখের জল মুছলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব মহারাজ, আদেশ করুন।'

পাটলিপুত্র নগরীর প্রবেশদ্বার চারটি। তার মধ্যে যেটি গঙ্গার ধারে, সেখানে এক প্রহরী দাঁড়িয়ে নাগরিকদের গতিবিধি পর্যালোচনা করছিল। সম্রাট সপারিষদ বিজয়যাত্রায় গেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীর সর্বত্র কাজেকর্মে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে।

যে প্রহরী নাগরিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন তিনি কোনও সামান্য ব্যক্তি নন, পাটলিপুত্রের প্রধান দৌবারিক মতিল। মগধ সাম্রাজ্যের দণ্ডপাশিক নাগদত্তর কঠোর আদেশ, পাটলিপুত্রে আগত এবং পাটলিপুত্র হতে নির্গত প্রতিটি নাগরিকের উপর যেন দৃষ্টি রাখা হয়। মহাপ্রতিহার রুদ্রদেব-এর কাছে গোপন সংবাদ আছে, গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও সংবাদ পাটলিপুত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তাই মতিল স্বয়ং এই দ্বারের দৌবারিক হয়েছেন।

একটু পরেই একটা কোলাহলের সংবাদ পেয়ে মতিল দেখলেন একটি রথ তাঁর দিকেই ধাবমান, আর তার সঙ্গে পথ-বালকবালিকাদের হইহই রব। মতিল আশ্চর্য হলেন দেখে যে রথের কোনও সারথি নেই, অথচ রথের গতি সাবলীল।

একটু পরেই তার কারণ বুঝতে পারলেন তিনি।

রথটি চালনা করছে এক অদ্ভুত দর্শন বামন। তাকে অবশ্য চেনেন মতিল। শুধু মতিল কেন, একে বোধকরি পাটলিপুত্রের প্রতিটি মানুষ চেনে।

এ হচ্ছে প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ দনুজদমনের ব্যক্তিগত ভৃত্য। ঘোরকৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, দুই হস্তের অনধিক উচ্চতা, এবং মাথায় ঘনমেঘের মতো পুঞ্জীভূত কেশরাজির এই বামনটি পাটলিপুত্রের একটি দর্শনীয় বস্তুবিশেষ। তদুপরি কিশোরটি মূক ও বধির, এবং সম্পূর্ণরূপে দন্তহীন। দনুজদমন নাকি উত্তরদেশে তীর্থ করতে গিয়ে একে ক্রয় করেন। তবে অদ্ভুতদর্শন হলে কী হবে, বামনটি যথেষ্ট গুণী। শুনেছেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই দনুজদমন গৃহিণীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। আর বিবিধ বাজিকরের খেলা বা মায়াজাল জানে সে। সেইজন্যই শিশুদের কাছে অতিশয় প্রিয়।

রথটি এসে থামলে মতিল হাতের সঙ্কেতে জানতে চাইলেন কী চায় সে? আর এই রথ ব্যবহারের অধিকারই বা সে পেল কী করে?

উত্তরে একটি ক্ষুদ্র লিপিকা বার করে মতিলের হাতে দিল সেই বালক। মতিল দেখলেন পত্রটি লিখেছেন দনুজদমনপত্নী।

রাজপরিষদ থেকে বিতাড়িত করলে কী হবে, সম্রাট কিন্তু তাঁর বিজয়শোভাযাত্রায় প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গী করতে ভোলেননি। বোধহয় আশঙ্কায় ছিলেন যে তাঁর অবর্তমানে অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ দনুজদমন সেনাবাহিনীর একাংশকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী হতে পারেন।

লিপিকাটি দৌবারিক-এর প্রতি। তাতে লেখা আছে যে এই কিশোর একটি বিশেষ পত্র নিয়ে মহারাজাধিরাজের শোভাযাত্রার দিকে যাচ্ছে। পত্রটি দনুজদমনপত্নী লিখেছেন তাঁর পতির উদ্দেশে। পত্রটি যত দ্রুত সম্ভব প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষর কাছে পৌঁছনো প্রয়োজন। তাই এই রথ ব্যবহারের অনুমতি তিনিই দিয়েছেন। দৌবারিক মহাশয় যেন এই কিশোরের নির্বিঘ্ন নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

মতিল হাতের সঙ্কেতে মূল পত্রটি দেখতে চাইলেন। যা পরিস্থিতি, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব না, সে তিনি যতই প্রভাবশালী হন না কেন। কোন পত্রে কে যে কাকে কোন গূঢ় সংবাদ পাঠাতে চায় সে অনুমান করা অসম্ভব। গত মাসেই তিনজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে পাটলিপুত্রে। প্রবল শারীরিক নিগ্রহের পরেও তারা জানায়নি যে তাদের প্রভু কে। এই জটিল এবং ঝঞ্ঝাটময় সময়ে কে যে কার অনুগত, কে যে কার

সঙ্গে কোন সূত্রে সম্পর্কিত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাই প্রতিটি সংবাদ উত্তমরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কিশোরটি ঘন ঘন মাথা নেড়ে জানালো যে সে কিছুতেই মূল পত্রটি হস্তান্তর করবে না। এসব আপত্তিতে অবশ্য মতিল কোনওদিনই খুব একটা কান দেন না। তিনি কিশোরের গণ্ডদেশে একটি চপেটাঘাত করে মূল পত্রটি হস্তগত করলেন।

পত্রটি সংক্ষিপ্ত। দনুজদমনপত্নী তাঁর পতিকে জানাচ্ছেন যে তাঁদের কন্যা ভামিনী গর্ভবতী হয়েছে। আপাতত পিতৃগৃহে অবস্থান করছে সে। এই আনন্দসংবাদ দেওয়ার পাশাপাশি প্রেরক এও জানাচ্ছেন যে স্বামী যেন সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন, দ্রুত পাটলিপুত্রে ফিরে আসার জন্য। ভামিনী বড়ই পিতৃসোহাগী মেয়ে। পিতার জন্য তার বড়ই মন কেমন করছে।

অতি সাধারণ সাংসারিক পত্র, কোনও গোপন গূঢ়লেখ নয়। তাও পত্রটি বারবার পড়লেন মতিল। গোপন সংবাদ বা সঙ্কেত উদ্ধারে বিশেষ পারদর্শিতা আছে তাঁর। বহুরকমভাবে পত্রটি পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোনও গোপন সঙ্কেত উদ্ধার করতে পারলেন না।

এইবার কিশোরের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করা শুরু করলেন মতিল। একইসঙ্গে রক্ষীদের আদেশ দিলেন রথটি ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য।

কিন্তু নাহ, সেখানেও ব্যর্থ হতে হল তাঁকে। কোথাও কোনও গোপন সঙ্কেত নেই। অথচ তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে।

অবশেষে এক কৌশল করলেন তিনি। কিশোরকে নতুন বস্ত্র দিলেন পরিধানের জন্য। সঙ্গে আনা চিপিটকাদি বহন করার জন্য অন্য বস্ত্রখণ্ড দিলেন। আর রথের বদলে একটি বেগবান অশ্ব দিলেন যাতে কিশোরটি আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

কিশোর বাক্যব্যয় করল না। নিষ্পাপ অমল হাসিতে মুখমণ্ডল ভরিয়ে যাত্রা শুরু করল সে।

দত্তাদেবীর মুখখানি ক্রোধে থমথম করছিল। তিনি শীতল কণ্ঠে চন্দ্রগুপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম তুমি নাকি প্রজাদের প্ররোচনা দিচ্ছ রামগুপ্তর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে? এ কথা কি সত্য?'

চন্দ্রগুপ্ত এত অবাক হয়ে গেলেন যে, প্রথমে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

কাল সারাদিন তিনি ব্যস্ত ছিলেন যাত্রা নির্বিঘ্ন করার কাজে। সম্রাটের শোভাযাত্রা তো আর সাধারণ্যের তীর্থযাত্রা নয়। তার প্রস্তুতিও রাজসূয় যজ্ঞায়োজনের থেকে কম কিছু নয়। প্রথমে স্থির করতে হয় শোভাযাত্রার পথ। তারপর নিশ্চিত করা হয় যে সে পথ সুনির্মিত, অনুচ্চাবচ এবং খন্দহীন। মহারাজাধিরাজের অঙ্গরক্ষকরা দেখেন সেই পথে কোনও অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা আছে কিনা। যেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হবে সেখানে বন্যজন্তু বা শত্রুপক্ষের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি নেই। খাদ্য এবং পেয় জলের উৎস নিশ্চিত করা হয়।

চন্দ্রগুপ্ত'কে অন্য সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আপাতত তাঁকে সম্রাটের প্রধান অঙ্গরক্ষকের পদ দেওয়া হয়েছে। এ যেন মহাসেনানায়ককে সাধারণ চৌরধনিক পদে নিয়োগ করা। এই প্রবল অসম্মানের কারণ সবাই জানেন, বোঝেন। কিন্তু কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না।

চন্দ্রগুপ্ত অবশ্য কর্তব্যে অবিচল। যা দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়, তার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ সুবিচার করেন। তাঁর অধীনে থাকা সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে যথাসময়ে সুসম্পাদিত হয়। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশই তিনি কাউকে দেন না।

আজ প্রভাতে রাজমাতার আদেশ পেয়ে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। বহুদিন হল তাঁর গর্ভধারিণীর সঙ্গে বার্তালাপ করেন না। রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁকে যেন একপ্রকার অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। যেন তাঁকে বিদায় করতে পারলেই তাঁর বংশ, তাঁর পরিবার সর্বান্তকরণে সুখী হয়।

তাই চন্দ্রগুপ্ত দ্রুত এসেছেন রাজমাতার শিবিরে। এসে যথাবিহিত পাদবন্দনা করে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, 'কী আদেশ রাজমাতা?'

আর তার পরেই এই অন্যায় এবং বিস্ফোরক অভিযোগ।

নিজেকে সংহত করতে কিছু সময় নিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তারপর তিনি অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'আমি গুপ্তবংশের সন্তান মা, এই বংশের প্রতি আমার আনুগত্য অচল এবং অপরিবর্তনীয়। এ নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আজ অবধি আমার আচার আচরণে এর কোনও ব্যত্যয় দেখেছেন?'

'দেখিনি, তবে শুনেছি।'

'কী শুনেছেন মা? এমন কী সূচনা আপনার কানে এসেছে যার জন্য আপনি আমার নামে এত বড় একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন?'

'শুনেছি তুমি নাকি ইতর প্রজাসাধারণ, সামান্য সৈন্যবর্গ, সবার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করো? তোমার নিজের সম্মান থাকুক না থাকুক, গুপ্তবংশের গৌরবের কথাটাও কি ভুলে গেছ?'

'ইতর জনসাধারণ বা সামান্য সৈন্যবর্গের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা কবে থেকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে বিবেচিত হল মা?'

'আমার সন্দেহ এইভাবে তুমি ওদের তোমার স্বপক্ষে সংগঠিত করছ যাতে সম্রাটের প্রতি সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের অখণ্ড আনুগত্য আর অখণ্ড না থাকে।

'কিন্তু মা, পিতা কি জন্মাবধি আমাদের সেই শিক্ষাই দেননি? পিতার কি এই নির্দেশ ছিল না যে নিজের সুখ ও বিলাসের আগে প্রজাদের সুখ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে হবে? তিনিই তো বলেছিলেন জনগণই ঈশ্বর, সম্রাট তাঁদের প্রতিভূ মাত্র।'

দত্তাদেবী পুত্রের চোখে চোখ মেলাতে পারেন না, 'হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে তুমি তোমার পিতার কথা মান্য করতে গিয়ে নিজের ছায়ায় নিজের অগ্রজকে আবৃত করে ফেলবে! মনে রেখো চন্দ্র, তুমি নও, গুপ্তসাম্রাজ্যের মহারাজাধিরাজ এখন রামগুপ্ত।'

'বেশ। তাহলে এই সাম্রাজ্যে এখন আমার কী ভূমিকা?'

'যা তোমাকে তোমার জ্যেষ্ঠ বেছে দেবেন।'

ম্লান হাসেন চন্দ্রগুপ্ত, 'কোন জ্যেষ্ঠর কথা বলছেন মা? যাঁর আচরণ দেখলে মনে হয় যিনি আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগতই নন? যিনি আমাকে অহরহ সর্বসমক্ষে অপমানিত করেন, হেয় করেন, দলিত করেন? যিনি আমার সঙ্গে সাধারণ বাক্যালাপ অবধি করেন না? যিনি আমাকে সাধারণ অঙ্গরক্ষক করে রেখেছেন, সেই জ্যেষ্ঠর কথা বলছেন মা?'

দত্তাদেবী নীরব রইলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বলতেই থাকলেন, 'আর শুধু কি আমি? বাকি রাজপার্ষদরা? তাঁদের সঙ্গে কী ঔদ্ধত্য এবং দম্ভের সঙ্গে কথা বলেন সম্রাট সে সংবাদ আপনাকে কেউ দেয়নি রাজমাতা? এমনকী শিখরস্বামীর মতো প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মহামন্ত্রীকে অবধি বৃদ্ধ এবং মূর্খ বলে উপহাস করতে ছাড়েন না তিনি।'

দত্তাদেবী অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আর মহাদেবী ধ্রুবা? তাঁর প্রসঙ্গে কী বলবেন মা? আপনি তো আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন কী অসহ দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাদেবী?'

'চন্দ্রগুপ্ত!' চিৎকার করে উঠলেন রাজমাতা দত্তাদেবী, 'নিজের অগ্রজের বৈবাহিক জীবন নিয়ে কটুকথা বলার ধৃষ্টতা তোমার হল কী করে? মনে রেখো চন্দ্র, তোমাদের মধ্যে এককালে যা সম্পর্কই
থাকুক না কেন, ধ্রুবা এখন মহারাজাধিরাজ রামগুপ্তর সম্পত্তি। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে তুমি ব্যস্ত না হলেই আমি খুশি হব। কথাটা যেন স্মরণে থাকে।'

চন্দ্রগুপ্তর কানে 'সম্পত্তি' শব্দটি বড় কটু শোনাল। তিনি কিছু বললেন না, রাজমাতাকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দৌবারিকপ্রধান মতিল নিজের কপালে সজোর করাঘাত করলেন। স্ত্রীজাতির পেটে যে কোনও গোপন কথা থাকে না, এই আপ্তবাক্যটি তাঁর স্মরণে রাখা উচিত ছিল। এখন যে কী করে এই ঝঞ্ঝাট সামাল দেবেন তার কোনও উপায় তাঁর বুদ্ধিতে আসছে না।

মন্ত্রগুপ্তি হচ্ছে রাজপুরুষদের প্রধানতম চরিত্রভূষণ। খুব সম্ভবত তাঁদের আচার সংহিতার প্রথম বাক্যটিই হচ্ছে 'যাহা যাহা দেখিবেন, জানিবেন এবং শুনিবেন, কদাচ ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ করিবেন না। প্রকাশ করিলেই মরিবেন।' আর মতিল সেই আপ্তবাক্যটিই লঙ্ঘন করে বসে আছেন।

মতিলের স্ত্রী অপালা হচ্ছেন দনুজদমনকন্যা ভামিনীর প্রিয়সখী। দুজনে একই সঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন। মতিল তাই খেলাচ্ছলেই ভামিনীর গর্ভাধানের সংবাদটা বলে ফেলেছিলেন অপালাকে। বলেই বুঝেছিলেন যে কাজটা উচিত হয়নি। এই তথ্য কোনও গতিকে রাষ্ট্র হলে প্রকাশ পেয়ে যাবে যে পাটলিপুত্র থেকে প্রেরিত সমস্ত সংবাদ পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এমনকী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পারিবারিক সংবাদও। সে গুপ্তসাম্রাজ্যের পক্ষে গৌরবের কথা হবে না।

তাই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে দিয়ে গৃহদেবতা পরিহাসকেশবের নামে শপথ করিয়েছিলেন এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। অপালা কথা দিয়েছিলেন, এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাবে না।

অপালা অক্ষরে অক্ষরে তাঁর কথা রেখেছেন। যাঁকেই প্রিয়সখীর গর্ভাধানের সংবাদ দিয়েছেন, তাঁকে দিয়ে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, 'দেখো, কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।'

পরদিন প্রভাতে যখন মতিল কর্মস্থলের পথে যাত্রা করছেন, তখন প্রথমে দেখা পেলেন পণ্ডিত দেবশর্মার। তিনি হেঁকে বললেন, 'ওহে মতিল, সংবাদ শুনেছ তো? দনুজদমনের কন্যা নাকি গর্ভবতী? তাহলে তো ওঁকে একবার সংবাদটা পাঠাতে হয়।'

মতিল বিচলিত হলেও মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে বিগলিতস্বরে বললেন, 'তাই নাকি! তাহলে তো কিছু একটা করতেই হয় পণ্ডিত মহাশয়। দেখি কী করা যায়।'

আরও খানিক যাওয়ার পর দেখলেন বৈদ্যশ্রেষ্ঠ সুষেণ হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছেন। মতিলকে দেখে বললেন, 'শুনেছেন কাণ্ড! দনুজদমনের কন্যা নাকি গর্ভবতী। এদিকে সেনাধ্যক্ষ তো দেশে নেই। যাই, গিয়ে দেখি ওঁদের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা।'

মতিলের গলা শুকিয়ে গেল। তিনি কোনওক্রমে হেঁ হেঁ করতে করতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। কর্মস্থলের কাছাকাছি এসে দেখলেন বৃদ্ধা জাবালী একটি যষ্টি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন। জাবালী হলেন পাটলিপুত্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় ধাত্রী। কথিত আছে পাটলিপুত্রর অর্ধেক বাসিন্দা নাকি এঁর ক্রোড়েই পৃথিবীর আলো দেখেছেন। মতিলকে দেখে বৃদ্ধা দন্তহীন মুখে একগাল হেসে বললেন, 'শুনেছ বাছা মতিল, ভামিনী নাকি...'

মতিল দেখলেন তিনি আর হাঁটছেন না, রাজভবনের দিকে দৌড়চ্ছেন।

রুদ্রদেব আর নাগদত্ত যে রোষকষায়িত লোচনে মতিলের দিকে চেয়ে আছেন, তাতে সত্যযুগ হলে এতক্ষণে মতিলের ভস্মাস্থি গঙ্গায় বিসর্জন হয়ে যাওয়ার কথা। নেহাত ঘোর কলিযুগ বলেই মতিল ভারি ম্রিয়মাণ এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁদের সামনে বসে আছেন।

নাগদত্ত অপ্রসন্নস্বরে বললেন, 'কাল কী কী হয়েছিল সব বিশদে বর্ণনা করুন।'

মতিল পুরো কাহিনিটি বিবৃত করলেন।

'পত্রে কিছু ছিল না? কোনও গোপন সংবাদ?'

'না প্রভু।'

'শব্দের কোনও বিশেষ ক্রম? বর্ণের কোনও বিশেষ সংস্থাপন? প্রথম অক্ষরগুলি জুড়ে কোনও নির্দিষ্ট সঙ্কেত?'

'দেখেছি প্রভু। আপত্তিকর কিছুই পাইনি।'

'ওই কিশোরের সঙ্গে যা যা ছিল সব বিশদে পরীক্ষা করেছেন?'

'হ্যাঁ প্রভু। তাকে একটি নূতন বস্ত্র দিয়ে তার পরিহিত বস্ত্রটি পরীক্ষা করিয়েছি। রথের বদলে তাকে একটি দ্রুতগামী অশ্ব দিয়েছি। রথটিও বিস্তারিত ভাবে নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি।'

'হুম, এই কিশোরকে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার কারণ?'

'আজ্ঞে সম্রাটের বিজয়শোভাযাত্রা যেদিন যাত্রাশুরু করে, তার ঠিক আগেরদিন রাজসভায় তীর্থযাত্রার ফলাফল, কীসে কীসে পুণ্যলাভ হয়, কোন কোন তীর্থে কবে কবে যাত্রা প্রশস্ত, সে নিয়ে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সভাসদ আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কে যেন বললেন, রথারূঢ় বামন দেখলে নাকি পুনর্জন্ম হয় না। কে বলেছিলেন স্মরণে নেই। তবে কথাটা মনে থেকে গেছিল।'

'বটে? আর তাই তোমার কাল মনে হল যে ওই কিশোরের মাধ্যমে কোনও গোপন সংবাদ প্রেরণ করা হচ্ছে?' এবার রুদ্রদেব প্রশ্ন করলেন।

'শুধু তাই নয় প্রভু। তার সঙ্গে থাকা সামগ্রীর মধ্যে আমি এইটি পেয়েছিলাম।' বলে একটি শস্ত্রী বার করলেন মতিল।

'কী বিশেষত্ব আছে এই শস্ত্রীতে?' শস্ত্রীটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলেন নাগদত্ত।

'ক্ষৌরকার্য করার জন্য ব্যবহৃত হয় প্রভু। মস্তক মুণ্ডনের সময়...'

'সে জানি মতিল' কঠিনস্বরে বললেন রুদ্রদেব, 'কিন্তু এর বিশেষত্ব কী সেটাই জানতে চাইছি।'

'এ ধরনের শস্ত্রী এতদ অঞ্চলে ক্ষৌরকার্যে ব্যবহৃত হয় না প্রভু। এই বালকের আছে এল কী করে? আর এই শস্ত্রী নিয়ে সে করেই বা কী?'

'হুম। প্রশ্নটি জটিল কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। আপাতত গাত্রোত্থান করো দেখি। একবার দেবী ভামিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। দনুজদমন আমাদের অনেক উপকার করেছেন। একবার তো সংবাদ নিতেই হয়।'

দনুজদমন ঘরনি সর্বমঙ্গলার মতো সার্থকনাম্নী রমণী অধিক পাওয়া যায় না। রূপে গুণে দয়ায় দাক্ষিণ্যে ইনি সত্যিই সর্বমঙ্গলা, প্রকৃতই মাতৃমূর্তি।

তিনজন রাজপদাধিকারীকে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। এঁদের তিনি দেবরতুল্য স্নেহ করেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে এঁরা বহুবার তাঁর ভবনে এসেছেন।

তিনজনেই সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভামিনীর শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সংবাদ নিলেন। কোনও অসুবিধা হলে তাঁদের তৎক্ষণাৎ জানাতে বললেন।

কথায় কথায় নাগদত্ত বড় সুকৌশলে সেই বামনের প্রসঙ্গ তুললেন। সর্বমঙ্গলা প্রসন্নস্বরে জানালেন এমন কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান দাস তিনি ইতিপূর্বে পাননি। মূক ও বধির হলে কী হবে, সর্বমঙ্গলার কখন কী চাই সে যেন আগেই বুঝতে পারত। তাকে ভারি ভরসা করেন তিনি। তাই অন্য কারও অবর্তমানে তার হাত দিয়েই স্বামীর প্রতি একটি পত্র পাঠিয়েছেন সর্বমঙ্গলা।

নাগদত্ত শস্ত্রীটি বার করে বললেন, 'সে সংবাদ জানি দেবী। যাত্রার সময় কোনওভাবে এটি বেচারির সঞ্চয় থেকে মাটিতে পড়ে যায়। আমরা কুড়িয়ে পেয়ে প্রত্যর্পণ করতে এসেছি।'

সর্বমঙ্গলা সরল চরিত্রের মানুষ। ক্ষৌরকার্যে ব্যবহৃত একটি সাধারণ শস্ত্রী প্রত্যর্পণ করতে যে তিনজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর একত্রে আসা যে অতি বিরল ঘটনা, সে সন্দেহ তাঁর মনে একবারও উদিত হল না। তিনি শস্ত্রীটি হাতে নিয়ে সস্নেহে বললেন, 'আহা রে, বেচারা। এবার সে মস্তক মুণ্ডন করবে কী করে?'

তিনজন চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। নাগদত্ত প্রশ্ন করলেন, 'মস্তক মুণ্ডন কেন দেবী? তার মাথায় তো শুনেছি ঘন কেশরাজি বর্তমান।'

সর্বমঙ্গলা বললেন, 'সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। এই কিশোরের কেশবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক দ্রুত। একবার কেশকর্তনের পর পক্ষকালের মধ্যেই তার মাথা আবার ঘন কেশরাজিতে ভরে যায়। তাই প্রতি অমাবস্যার দিন সে নিজেই তার মস্তক মুণ্ডন করে নেয়। আর এই হচ্ছে তার প্রিয় শস্ত্রী।'

রুদ্রদেব সতর্কস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এই শস্ত্রী তো মগধ অঞ্চলের ক্ষৌরকাররা ব্যবহার করেন না। এই কিশোর এই শস্ত্রী পেল কোথা থেকে?'

সর্বমঙ্গলা বললেন, 'সে তো জানি না ভাই। যিনি ওকে দিয়েছেন, তিনি বলতে পারবেন।'

নাগদত্তর ভ্রু কুঞ্চিত হল, 'এ কিশোর আপনাদের ক্রীতদাস নয়? আমি তো শুনেছিলাম আর্য দনুজদমন হিমালয়ে তীর্থ করতে গিয়ে একে ক্রয় করে এনেছিলেন।'

'না না। এই কিশোরকে আমার স্বামী ক্রয় করেননি। স্বামী যখন হিমালয়ে তীর্থযাত্রায় গেছিলেন, সেই সময় আরেকজন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। শুনেছি মাঝে তিনি দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পক্ষকালের জন্য অন্য কোথাও চলে যান। আবার ফিরে আসেন এই কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে। বলেন ফেরার সময় এই কিশোরকে তার পিতামাতার কাছ থেকে কয়েক কাষায়পণের বিনিময়ে ক্রয় করে এনেছেন। তিনি একে আমাদের দিয়েছিলেন আপাতত তাঁর ভবনে নতুন কোনও দাস রাখার ব্যবস্থা নেই বলে।'

তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

সর্বমঙ্গলা বলে চললেন, 'গত অমাবস্যা থেকে এ নিজের প্রভুর ভবনেই ছিল। গতকালই আমি একে চেয়ে আনি, সংবাদ পাঠানোর জন্য।'

তিনজনে প্রায় একইসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কে তিনি? কে এই বালকের প্রকৃত প্রভু?

সেইদিনই রুদ্রদেব অতি সন্তর্পণে একটি অত্যন্ত সুশিক্ষিত পারাবত উড়িয়ে দিলেন আকাশে। তার নখরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পত্র।

অবশেষে দীর্ঘযাত্রার পর হিমালয়ের পাদদেশে এক অপূর্ব শোভামণ্ডিত উপত্যকার মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বিজয়যাত্রা। কুসুমাস্তীর্ণ গহীন উপত্যকাটি দেখলে স্বর্গের অমরাবতী বললে ভ্রম হয়। চারিদিকে বিস্তৃত হরিৎ

তৃণভূমি। তার শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরদিগন্তে নগাধিরাজ হিমালয়ের বিভিন্ন হিমাবৃত শৃঙ্গশ্রেণী চলে গেছে সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো। আর সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে এক খরস্রোতা কল্লোলিনীর। এই উপত্যকার পাশ দিয়েই মহাকলধ্বনি সমারোহে বয়ে চলেছে সেই নদী।

মহাদেবী ধ্রুবাও যেন এই সুরম্য পরিবেশে এসে কিঞ্চিৎ সহজ হয়েছেন। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান, আপন খেয়ালে গান করেন, নদীর জলে পা ডুবিয়ে কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাসে ভেসে যান।

তবে কখনই একা থাকেন না। সঙ্গে থাকে পরিচারিকা আর কিঙ্করীর দল। আর বেশ কিছুটা দূরে থাকে একদল প্রশিক্ষিত সৈন্য। যতই নিরাপদ স্থান হোক, গুপ্তবংশের পটমহিষী বলে কথা, তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র রাখতে হবে বৈ কি!

চন্দ্রগুপ্ত শিবিরে অনুপস্থিত। কয়েকদিন পূর্বেই তিনি একটি ছোট সৈন্যদল নিয়ে গেছেন আশেপাশের কিছু অঞ্চল ঘুরে দেখবেন বলে। ফিরবেন কয়েকদিন পর। অনুগত ভ্রাতা কচকে নিজের দায়িত্ব দিয়ে বলে গেছেন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। কচগুপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন এত সতর্কতার প্রয়োজন কী। চন্দ্রগুপ্ত কোনও উত্তর দেননি। বেগবান অশ্বে আরোহন করে দ্রুত উধাও হয়েছেন।

একদিন সম্রাট রামগুপ্ত বস্ত্রাবাসের মধ্যে বসে পাত্র-মিত্র সমভিব্যহারে প্রমোদে মত্ত, এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিল, ‘প্রভু, দুইজন স্থানীয় প্রজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আদেশ হলে তাদের নিয়ে আসি প্রভু?’

প্রভুর আদেশে এক নারী এবং এক পুরুষ এসে আভূমি প্রণাম করেন দাঁড়াল। পোশাকে-আশাকে বোঝাই যায় যে, এরা এই অঞ্চলের বাসিন্দা। পুরুষটি গৌরবর্ণ এবং কৃশকায়। তাঁর চোখেমুখে সর্বদাই একটা কৌতুকের ভাব খেলা করছে। পুরুষটির হাতে একটি বিদেশি বাদ্যযন্ত্র।

আর নারীটি?

তার দিকেই নিষ্পলকে তাকিয়েছিলেন রামগুপ্ত। এ কি মানবী নাকি দেবী রতি স্বয়ং? আহা, নারী এত কমনীয়, এত মনোলোভা, এত সুন্দরীও হয়?

জানা গেল, এরা এই অঞ্চলের এক বিশেষ উপজাতি মানুষ। বিভিন্ন উৎসবে সমাবেশে নেচে গেয়ে আনন্দ দেওয়াই এদের পেশা। বংশানুক্রমে এরা এই কাজ করে এসেছে। এত বড় সৈন্যাবাস দেখে তারা ভেবেছে এখানে এলে তাদের হয়তো কিছু উপার্জন হবে। মহারাজ আদেশ করলে তারা নিজেদের গায়ন এবং নৃত্যশৈলী পরিবেশন করতে ইচ্ছুক। আর পুরুষটি সঙ্গে এনেছে অতি উৎকৃষ্ট গঞ্জিকার একটি নাতিবৃহৎ পেটিকা। এই অঞ্চলের গঞ্জিকা অতীব উত্তম।

সেদিন অনেক রাত অবধি নাচ গান মদ্য এবং গঞ্জিকাসেবনের আসর বসল রামগুপ্তর শিবিরে। উৎসব শেষ হলে রামগুপ্ত নারীটিকে নিয়ে বস্ত্রাবাসের দ্বার রুদ্ধ করলেন। আর পুরুষটি অন্ধকারের মধ্যে কোথাও গেল কেউই লক্ষ করলেন না।

ভোররাত্রির সময় সমগ্র সেনাশিবির যখন ঘুমে অচেতন, তখন রামগুপ্তর বস্ত্রাবাস থেকে বেরিয়ে এল সেই নারী। অপর পুরুষটি কাছেই ছিল। সে সাগ্রহে এসে প্রশ্ন করল, ‘কী রে, কেমন আছিস? সব ঠিকঠাক হয়েছে তো? গর্ভস্রাবটা তৃপ্ত হয়েছে তো?’

নারীটি ফিক করে হেসে বলল, ‘ধুর, কিচ্ছু পারে না। বিষ ঢালবে কি, ফণা তুলে দাঁড়াতে পারলে তো। তবে কাজের কাজটা হয়েছে। কালই শিবির উঠে যাচ্ছে যেখানে যেতে বলেছি, সেখানে। মহারাজ এবার আমাদের পুরস্কারে ভরিয়ে দেবেন গো!’

দুজনেই চাপাস্বরে হাসাহাসি করল কিছুক্ষণ। তারপর শিবিরের একদম পিছনের অংশ দিয়ে বেরিয়ে আধো অন্ধকারে মিশে গেল তারা।

চন্দ্রগুপ্ত যেখানে এসে পৌঁছলেন সে আরও উত্তরে। এই পথ ধরে চলতে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্যভূমি কশ্যপমীরে উপনীত হওয়া যায়। পশ্চিমে এই পথ পৌঁছেছে শাকল ও গান্ধার।

স্থানটি অতি মনোরম পার্বত্য অঞ্চল। চন্দ্রগুপ্ত যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন সেটিকে প্রথম দৃষ্টিতে পটচিত্রে অঙ্কিত কোনও সুরভূমি বলে ভ্রম হয়। নগাধিরাজ হিমালয়ের ক্রোড়ে লুকিয়ে থাকা এই জনপদ প্রকৃতই মনোহারিণী।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তর মনে শান্তি নেই। এমন মনোহারী প্রকৃতি সন্দর্শনেও তাঁর রুচি নেই। তিনি যেন ভূতগ্রস্ত। যেখানেই যান কেবলই সেখানকার ক্ষৌরকারদের সঙ্গে কথা বলেন, আর একটি পত্র বার করে তাতে অঙ্কিত একটি শস্ত্রীর ছবি দেখান। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। এইভাবে এক একটি করে অসফল দিনের শেষ হয় আর চন্দ্রগুপ্তর মুখে চিন্তার ঘন মেঘ আরও গাঢ় হয়।

একদিন প্রভাতে তিনি নিজের ক্ষুদ্র শিবিরে বসে ছিলেন। কপালে চিন্তার ভ্রুকুটি, মুখখানি গম্ভীর। এমন সময় একজন সহচর এসে বলল, 'প্রভু, এই গ্রামের মণ্ডলপ্রধান আপনার দর্শনাভিলাষী।'

চন্দ্রগুপ্ত সম্মতি জানাতেই এক প্রৌঢ় সামনে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন, 'অহো, কী সৌভাগ্য আমাদের। কুমার চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং এই গ্রামে পদার্পণ করেছেন। ধন্য হল আমাদের এই গ্রাম, ধন্য হল আমাদের জন্মভূমি।'

চন্দ্রগুপ্ত প্রতি নমস্কার করে তাঁকে বসতে বললেন। প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটি তরুণীও এসেছিল। এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ গৌর। কিন্তু এই তরুণী সামান্য শ্যামাঙ্গী। ঈশ্বর যেন পৃথিবীর সমস্ত রূপ ঢেলে দিয়েছেন এই মেয়ের শরীরে। এমন স্নিগ্ধ, এমন কমনীয় সৌন্দর্য কমই দেখেছেন চন্দ্রগুপ্ত। অথচ সেই স্নিগ্ধতার মধ্যেও কোথাও যেন এক শান্ত কিন্তু ক্ষুরধার দার্ঢ্য লুকিয়ে আছে। তার সঙ্গে প্রৌঢ় পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার কন্যা, কালি।'

নামকরণের সার্থকতা প্রমাণিত হল। চন্দ্রগুপ্ত স্নেহমিশ্রিত সুরে বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন মা।'

চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত অপরিচিতা নারীকে মাতৃসম্বোধন করেন। কালি নামের সেই কন্যা প্রতিপ্রণাম করে বললেন, 'সসাগরা অখণ্ড জম্বুদ্বীপের অধিপতি, গুপ্তসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট, সর্বরাজোচ্ছেত্তা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তকে কালির প্রণাম।'

চন্দ্রগুপ্ত অপ্রস্তুত হলেন। তিনি সম্রাট নন, কুমার মাত্র। সম্রাটের অঙ্গরক্ষক দলের প্রধান। প্রৌঢ় বিব্রতস্বরে বললেন, 'এই অর্বাচীন বালিকার কথায় কান দেবেন না প্রভু। এর অভ্যাস আছে অকস্মাৎ এরকম অযথা অসংলগ্ন কথা বলার। আমি সর্বান্তকরণে ক্ষমাপ্রার্থী।'

চন্দ্রগুপ্ত হেসে ফেললেন। 'ঠিক আছে প্রধান। অত লজ্জিত হওয়ার কিছু হয়নি।'

প্রধান বিব্রতস্বরে বললেন, 'কী করে যে এই অবাধ্য মেয়ের বিয়ে দেব কে জানে। একে তো যত্রতত্র অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে বেড়ায়। তার উপর যত হিংস্র বন্যজন্তুর সঙ্গে এর প্রীতি। সে তরক্ষু হোক বা বিষধর সর্প।'

'বটে?' চমৎকৃত হলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'কীরকম?'

'এই গ্রামের ঠিক বাইরে একটি ছোট উপত্যকা আছে। সেখানে একটি সুমিষ্ট জলের ঝরনাও আছে। কিন্তু সেই উপত্যকায় ভয়ানক সব বিষধর সর্পের বাস। ভয়ে এই গ্রামের কেউই সে অঞ্চলে যায় না। কিন্তু এই অবাধ্য মেয়ে সে কথা শুনলে তো।'

আশ্চর্য হলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'এরকম প্রতিভা তো সচরাচর দেখা যায় না। এই শ্যামবর্ণা সুন্দরী আপনার ঘর আলো করলেন কীভাবে?'

‘আমি কর্মসূত্রে বহুকাল বঙ্গদেশে ছিলাম প্রভু। একটি বৌদ্ধবিহারে দ্বারপালের কাজ করতাম। সেখানে এক ভিক্ষুণী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল প্রজ্ঞা। তিনি মুণ্ডমালাতন্ত্র এবং বারাহীতন্ত্রে সিদ্ধা ডাকিনী ছিলেন।

তিনি এই অর্ধশিক্ষিত বর্বরের মধ্যে কী দেখেছিলেন আজও জানি না। তাঁর সঙ্গে আমার প্রণয় হয়। একদিন ঘোর বর্ষার রাত্রিতে আমরা সেই বিহার ছেড়ে পলায়ন করি। প্রজ্ঞা তখন গর্ভবতী।

কালির জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে আমার স্ত্রী মারা যান। আমার কন্যা একেবারে তার মায়ের অবিকল প্রতিকৃতি। তিনিই মেয়ের নাম রেখেছিলেন, কালি।’

চন্দ্রগুপ্তর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। যাক, কেউ তো অন্তত পেরেছিল তার প্রেয়সীকে নিতে পালিয়ে যেতে। এই দরিদ্র প্রৌঢ়ের মুখে ভালোবাসার যে অমিত ঐশ্বর্য ঝলমল করছে, তিনি বোধহয় কোনওদিনই তার ভাগীদার হতে পারবেন না।

কালি দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না সম্রাট। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আপনি অচিরেই এই ভারতভূমির অপ্রতিহত অধিপতি হবেন। এর অন্যথা হবে না, হবে না, হবে না।’

চন্দ্রগুপ্ত ম্লান হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘সে কথা থাক। আপাতত আমাকে জানান সম্প্রতি আপনাদের গ্রামে বা এই অঞ্চলে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে?’

প্রধানের ক্ষুদ্র কুটিরে যখন চন্দ্রগুপ্ত এবং অন্যান্যরা এসে পৌঁছলেন, তখন সুনীল দ্বিপ্রহর। সুস্পষ্ট আকাশের বুকে মাথা তুলে আছে নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি। পাহাড়ের অনেক নীচে এক নাম না জানা খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। পথের ধারে কত না পুষ্পেপত্রে শোভিত বৃক্ষ ও গুল্মের দল। আজন্মকাল গাঙ্গেয় উপত্যকায় মানুষ চন্দ্রগুপ্তর চোখে এসবই বড় নূতন, বড় আশ্চর্য ঠেকে।

কুটিরের দাওয়াতে বসে একজন তরুণ কুমার। তাঁর সামনে একটি তালিপত্র খোলা। সেখানে খাগের কলম দিয়ে তিনি কী যেন লিখছেন। তাঁর দেহখানি সুগঠিত ও কমনীয়। কুঞ্চিত কেশরাশি নেমে এসেছে স্কন্ধাবধি।

চন্দ্রগুপ্ত সামনে এসে স্মিতস্বরে বললেন, ‘মিত্র, কেমন আছেন?’

যুবকটি চন্দ্রগুপ্তর দিকে তাকালেন। চোখদুখানি নিষ্প্রাণ উদাস হলে কী হবে, অমন মায়াবী চোখ পুরুষ মানুষের কমই হয়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনও বোধ নেই, ভাষা নেই, প্রাণের সাড়া নেই।

প্রধান চুপিচুপি বললেন, ‘কালি যখন একে গ্রামের বাইরে খুঁজে পায় তখন ও প্রায় মরেই গেছে। কালি কোনওমতে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে ওকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসে। তারপর আমরা বহু কষ্ট করে বাঁচিয়ে তুলেছি একে। কিন্তু এর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। এখানে আসার আগে এ কোথায় থাকত, কী করত, পিতৃপরিচয়, সংসার পরিবার কিছুই মনে করতে পারছে না। শুধু একটি জিনিসই পারে।’

বলে সেই তালিপত্রটির দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রধান।

চন্দ্রগুপ্ত সামান্য নীচু হয়ে তালিপত্রটি তুলে নিলেন। দেখলেন সেখানে অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে এই কটি পংক্তি,

‘কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।

চন্দ্রগুপ্তর অন্তস্তল যেন এক অসহ্য স্নিগ্ধ আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল তিনিই যেন সেই বিরহী যক্ষ যাঁর গহীন দুঃখের গাথা এই স্মৃতিভ্রষ্ট ক্ষণজন্মা কবি আগুন এবং জলের আখরে লিখে চলেছেন। যাবতীয় অপ্রাপ্তির বেদনা, ব্যর্থ প্রেমের কষ্ট, ফুরিয়ে যাওয়া স্বপ্নের ছাই তাঁর দুই গণ্ডদেশ বেয়ে অবারিতধারায় নেমে আসতে লাগল। আহা রে জীবন, তিনি কিছুই পেলেন না। তাঁর কিছুই হল না।

বাকিরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মহাকঠোর, মহাকর্তব্যনিষ্ঠ মহাসংগ্রামী প্রতাপী বীর চন্দ্রগুপ্তর হৃদয়েও যে এমন অন্তঃসলিলা প্রেমের ফল্গুধারা বইছে, কে জানত সে কথা?

সেইদিন রাত্রিবেলা গ্রামের কামারশালার বাইরে বসে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে ভারি বিদগ্ধ আলোচনা জমে উঠেছিল। সঙ্গে উৎকৃষ্ট সধূম গঞ্জিকা। গঞ্জিকাসেবনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বিশ্লেষণী শক্তি, অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানপিপাসা বহুগুণে বর্ধিত হয়। সেই নিবিড় জ্ঞানচর্চার আলোতে ঋদ্ধ হচ্ছিল দুয়েকটি পাহাড়ি সারমেয়।

হারীত হচ্ছে এই কামারশালার কর্তা। সে কলিকায় একটি টান দিয়ে বলল, 'বল দেখি সুনন্দ, সম্রাট রামগুপ্ত এখন কী করছেন?'

সুনন্দ হচ্ছে গ্রামের ক্ষৌরকার। সে অর্ধনিমীলিত নয়নে বলল, 'তিনি কি আর আমাদের মতো রে হারীত? দেখ গিয়ে, রাত নামতেই তিনি হয়তো যবের মণ্ড আর কন্দসিদ্ধ খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।'

কথাটা নানাভাবে বিচার করে দেখল হারীত। তারপর সিদ্ধান্তে এল, বক্তব্যটি যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত বটে। আরও একটা টান মেরে কলিকাটি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কুমার চন্দ্রগুপ্ত?'

সুনন্দ অভিজ্ঞ গঞ্জিকাসেবী। সে বেশ একটা বড় কলকেয় টান মেরে বলল, 'তিনি বোধহয় এখনও অন্য কোনও গ্রামে ক্ষৌরকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।'

হারীতের এই কথাটাও বেশ মনে ধরল। তবে কি না শাস্ত্রে বলেছে তদবিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। তার মনে এই কূট প্রশ্নের উদয় হল—'আচ্ছা, রাজা মহারাজাদের তো শুনেছি অনেক কিছু সংগ্রহ করার বাতিক আছে। চন্দ্রগুপ্ত কি ক্ষৌরকার সংগ্রহ করতে চাইছেন? পাটলিপুত্রে কি ক্ষৌরকারের খুব অভাব?'

সুনন্দ ভারী ভাবনায় পড়ল। তাকে যদি চন্দ্রগুপ্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যান, তাহলে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে?

চিন্তাটা বেশ ঘনিয়ে আসার আগেই দুজন চমকে উঠল সারমেয়র গর্জনে। সেই শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে চূর্ণ করে দিল রাত্রির নিঃস্তব্ধতা।

দুজনেই সতর্ক হল। এরা চেঁচায় কেন?

একটু পরেই তার কারণটি পরিস্ফুট হল। অন্ধকারের মধ্য থেকে একটি খর্বাকৃতি মানুষ বেরিয়ে এসে সুস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আপনাদের একজন তো ক্ষৌরকার, আরেকজন লৌহকার। আমার পছন্দমতো একটি শস্ত্রী বানিয়ে দিতে পারেন? যে পরিমাণ অর্থ চান দিতে পারি।'

এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাত বড় স্নিগ্ধ, বড় নির্মল, বড় পবিত্র। দেব দিবাকর উদিত হলেই দিনের প্রথম অরুণাংশু ছুঁয়ে ফেলে ওই গম্ভীর পর্বতচূড়ার শিখর। সেদিকে তাকালে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে শতসহস্র স্বর্ণধারার স্রোত।

গত রাত্রি এই কুটিরেই অতিবাহিত করেছেন চন্দ্রগুপ্ত। বাসনা ছিল কবির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ আলাপের। সে বাসনা অবশ্য তাঁর সামান্যই পূর্ণ হয়েছে। এই আশ্চর্য মানুষটির কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেছেন তিনি। দেবী সরস্বতী যেন স্বয়ং বাস করেন মানুষটির ওষ্ঠাগ্রে। শুধু রমণীয় ভাষা নয়, সুললিত ছন্দ নয়, এঁর রচিত প্রতিটি পদের মাধুর্য তার হৃদয়গ্রাহী সরলতায়। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ, ধ্বনির মাধুর্য যেন মনের অন্তস্তল ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু কী তাঁর পরিচয়, তাঁর দেশ কোথায়, তিনি কোন জাতির লোক, কে তাঁর পিতা-মাতা এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর কিছুই মনে নেই। কে যেন সর্বগ্রাসী মহাশূন্যতা দিয়ে তাঁর স্মৃতির একটি বৃহৎ অংশ মুছে দিয়েছে।

কুটিরের বাইরে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন চন্দ্রগুপ্ত। আহা, কী অনুপম শোভা। এই সুবিশাল মহত্বের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় ভাব জেগে উঠল। তিনি পূর্বাস্য হয়ে প্রণাম করলেন, ওঁ দিবাকুসুম শঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম...

কিন্তু কুমারের মন্ত্রোচ্চারণ সম্পূর্ণ হল না। একটু পরেই ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে মহা কোলাহল উপস্থিত হল। কুমার তাকিয়ে দেখলেন গ্রামের কিছু বাসিন্দা একটি অদ্ভুতদর্শন বামনকে ধরে এদিকেই আসছে।

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার, এত কোলাহল কীসের?'

একজন গ্রামবাসী এগিয়ে এসে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'প্রণাম প্রভু। আমি সুনন্দ, এই গ্রামের নরসুন্দর। কয়েকদিন পূর্বেই আপনি আমার কুটিরে পদার্পণ করেছিলেন, একটি শস্ত্রীর চিত্র নিয়ে, মনে পড়ে?'

চন্দ্রগুপ্ত মাথা নাড়লেন। মনে পড়ে বৈ কি।

দ্বিতীয়জন এগিয়ে এসে প্রণাম জানাল, 'প্রভু, অধমের নাম হারীত। আমি এই গ্রামের লৌহকার।

গতকাল রাত্রির সময় আমি ও সুনন্দ আমার কুটিরের বাইরে বসে বিবিধ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। তখন এই বামন এসে প্রশ্ন করে আমি তার পছন্দের আকৃতির একটি শস্ত্রী প্রস্তুত করে দিতে পারি কিনা। তার জন্য সে আমাদের ইচ্ছেমতো অর্থ প্রদান করতে সক্ষম।

আমি সমর্থন জানাতেই সে একটি চিত্র দেখায় আমাদের। আর সুনন্দ দেখে সেই শস্ত্রীর আকৃতি আপনার প্রদর্শিত শস্ত্রীর আকারের একেবারে অবিকল প্রতিকৃতি! তৎক্ষণাৎ আমরা একে কৌশলে ও বলপ্রয়োগ করে স্ববশে আনি। তারপর আপনার কাছে এনেছি। এবার আপনার যা ইচ্ছা বিধান হয় করুন।'

চন্দ্রগুপ্ত সেই বালককে পরিপূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর তাঁর হনুদেশ কঠোর হয়ে উঠল।

একে অতি উত্তমরূপে চিনেছেন তিনি। এর কথাই রুদ্রদেব উল্লেখ করেছিলেন তাঁর পত্রে।

চন্দ্রগুপ্ত বামনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তারপর শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'রুদ্রসিংকে কোন গোপন সংবাদ দিতে গিয়েছিলিস?'

প্রশ্নটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বামনের শরীর একবার শক্ত হয়েই পুনরায় স্বাভাবিক হল। তার মুখে একটি অমলিন হাসি। যেন সে চন্দ্রগুপ্তর বক্তব্যের কিছুই বুঝতে পারছে না।

চন্দ্রগুপ্ত সজোরে একটি চপেটাঘাত করলেন। বামন মাটিতে ছিটকে পড়েই একটি দুর্বোধ্য আঁ আঁ স্বরে চিৎকার করে উঠল।

হারীত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'এ অভিনয় করছে প্রভু। এ কথা বলতে পারে। আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

চন্দ্রগুপ্ত ধীরেসুস্থে বামনের চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করালেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আবার প্রশ্ন করছি, কার কাছে কোন গোপন সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলিস তুই?'

বামনটি স্থির চোখে চন্দ্রগুপ্তর দিকে তাকালো। চন্দ্রগুপ্ত দেখলেন সেই চোখে আর যাই থাকুক, ভয় নেই।

চন্দ্রগুপ্ত আবার প্রশ্ন করতে যাবেন, এমন সময় কে যেন তাঁর পিছন থেকে আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ও! আবার এসেছে? আবার এসেছে কেন ও?'

চন্দ্রগুপ্ত দ্রুত ফিরে তাকালেন। দেখলেন কুটিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন সেই কবি। তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত। দু'চোখে ভয়। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। ধীরে ধীরে কম্পিত হাতখানি তুলে সেই বামনকে নির্দেশ করে বললেন, 'ও কেন এসেছে এখানে? আবার কাকে মারবে ও? কার ঘর ধ্বংস করবে?'

বলতে বলতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

এমন উত্তেজক দ্বিপ্রহর বোধহয় আগে কখনও আসেনি এই পার্বত্য জনপদের জীবনে। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে প্রধানের কুটির প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ প্রস্তরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে বামনকে। কুটিরের মধ্যে এক কোণে শুশ্রূষা চলছে কবির। কালি তাঁর মাথাটি নিজের কোলে নিয়ে মাথায় অতি স্নেহে শীতল জলের পট্টি লেপন করে মৃদুমন্দ বীজন করছেন। চন্দ্রগুপ্ত কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেছেন কবির শারীরিক অবস্থা সুস্থির করতে, এ তাঁর সামরিক শিক্ষার অন্তর্গত। প্রধান গেছেন পাশের গ্রাম থেকে স্থানীয় বৈদ্যকে ডেকে আনতে।

কালির কোলে শায়িত কবিকে দেখে নিজের অজান্তেই শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছিল চন্দ্রগুপ্তর। এই পৃথিবীর বুকে আর কত অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনবে রুদ্রসিংহ আর তার পোষা শ্বাপদের দল?

বামনকে দেখা মাত্র অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন কবি। তাঁকে দ্রুত কুটিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন চন্দ্রগুপ্তই। কিছুক্ষণ পরেই তাতে সাড়া দেন তিনি। আর অস্ফুটে বিবৃত করতে থাকেন এক নৃশংস নরসংহারের কথা।

এখন তাঁরা যেখানে আছেন সেই পথ ধরে উত্তর দিকে চার থেকে পাঁচ দিনের পথ গেলে কশ্যপমীরের উপত্যকা, ঋষি কশ্যপের পুণ্যভূমি। হিমালয়ের কোলে এ যেন একটুকরো স্বর্গ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও শোভায় এক অনুপম দেবভূমি। সহজ সরল জীবন ছিল তাঁদের, পাহাড়ি ঝরনার মতো উচ্ছল, উপত্যকার মতো গভীর, পর্বতচূড়ার মতো শুভ্র ও গরীয়ান।

সেখানে কয়েক দশক আগে থেকে এক বিজাতীয় জাতি এসে বসবাস শুরু করে। তারা গান্ধার ও পারস্য অঞ্চলের মানুষ, নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল শক বলে। তাতে অবশ্য কশ্যপমীরের বাসিন্দাদের আপত্তি ছিল না। তারা শান্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। তারা এই বিজাতীয়দের সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল।

ধীরে ধীরে শকদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাদের আচার বিচার ভাষা পূজা উপাসনা সবই পৃথক। মূল অধিবাসীরা শঙ্কিত হলেন। সংস্কৃতির বিরোধ বড় বিরোধ, আচারের প্রভেদ বড় প্রভেদ। শকদের সঙ্গে কশ্যপমীরের আদি বাসিন্দাদের বিরোধ শুরু হল।

সভ্য সমাজে সব বিরোধেরই সুস্থ নিষ্পত্তি হয়, সব প্রভেদই একদিন অস্বচ্ছ দেখায়। কিন্তু অসভ্য শকদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তাদের রক্তে শুধু একটিই অনুচ্চারিত আদেশ চলে ফিরে বেড়ায়—ছলে বলে কৌশলে অন্যজাতির ভূমি সম্পদ এবং নারী অধিগত করা। তারা বিশ্বাস করত এই ভূমিতে শুধু ওদের অধিকার, ওদের দেবতার অধিকার, ওদের সম্রাটের অধিকার।

তাই যে আশ্বিন পূর্ণিমার রাতে শকসম্রাট রুদ্রসিংহের প্রেরিত ঘাতকবাহিনী লোলুপ শ্বাপদের হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কশ্যপমীরের আদি অধিবাসীদের উপর, সেই রাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্থানীয়

শক বাসিন্দারাও। এতদিন ধরে যারা সভ্য সুন্দর প্রতিবেশী হওয়ার অভিনয় করছিল, সেই রাতে তারাই পথ দেখিয়ে এনেছিল স্বজাতির হিংস্র তরক্ষুদের।

কবি শুয়েছিল তার প্রেয়সীর পাশে। শিশুটিও ছিল। তাদের মনে হয়তো কোনও আশঙ্কা ছিল না। হয়তো তারা আস্থা রেখেছিল শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে। ঈশ্বরের কাছে সুনিবিড় প্রার্থনায় সমপর্ণ করেছিল নিজের সুখ, শান্তি ও নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ।

তাই যখন হিংস্র লোলুপ শকবাহিনী ঘিরে ধরল তাদের, অবিশ্বাস আতঙ্ক আর ভয় হতবুদ্ধি করেছিল তাদের।

তার প্রেয়সীকে তারই সামনে গণধর্ষণ করছিল ওরা। আর তাকে বাধ্য করছিল সেই দৃশ্য দেখতে। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেছিল। মাথার ভেতর জেগে উঠছিল এক অলীক শূন্যতা। তার বড় আদরের, বড় প্রেমের বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ষিতা হতে হতে জন্তুর মতো আর্তনাদ করছিল। আর তার প্রতি আর্তনাদের সঙ্গে অশ্লীল শব্দ করে হেসে উঠছিল ওই পাশব নারকীর দল, যেন কতই না আনন্দ হচ্ছে ওদের।

সে ধর্ষিতা হতে হতেও অনেকক্ষণ চেয়েছিল ওর দিকে। ভেবেছিল এই হয়তো কোনও অলৌকিক শক্তি ভর করবে তার প্রেমিক স্বামীর মধ্যে। আকাশ থেকে বজ্রপাত হবে, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহবতার বেশে প্রকট হবেন শ্রীমার্তণ্ডমন্দির থেকে। বিনাশ করবেন এই নারকী অসুরদের।

না। তার কিছুই হয়নি।

সেই আশ্বিন পূর্ণিমার রাতে ক্রমাগত গণধর্ষণের পর কবির চোখের সামনে ফেলে দেওয়া হয় তার প্রেয়সীর মৃতদেহ। সঙ্গে হিংস্র উল্লাসের শৃগালধ্বনি। আর তার পরেই মৃতা স্ত্রীর শরীরের ওপর টেনে এনে ফেলা হয় তাদের একমাত্র সন্তানকে।

অশক্ত, অসহায়, উন্মাদপ্রায় মানুষটা দেখছিল তার মৃতা স্ত্রীর দেহের ওপর পড়ে আছে তাদের একমাত্র সন্তান—তাদের সাত রাজার ধন, এক মাণিক। আর সেই অপাপবিদ্ধ শিশুর ওপর ঝুঁকে এসেছে এক অদ্ভুতদর্শন বামন। তার চোখে হিংস্র রক্তলোলুপ জিঘাংসা, আর মুখে নির্মল স্নিগ্ধ হাসি।

সেই বামন যখন তার হাতে তুলে নেয় এক বিচিত্রদর্শন শস্ত্রী, তখনও তার মুখ থেকে হাসিটি মিলিয়ে যায়নি। এমনকী যখন তার বিচিত্রদর্শন শস্ত্রীটি ধীরে ধীরে, কবির চোখের সামনে নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ শিশুটির কণ্ঠনালী ছেদ করে, তখনও নয়।

তার পর থেকেই কবির সামনে তার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়।

কুটিরের সামনে পুনরায় আবির্ভূত হলেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর মুখমণ্ডল অভিব্যক্তিহীন। হনু কঠিন এবং শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত।

তিনি বামনের কাছে এসে তাকে পরিপূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর অনুচ্চস্বরে আদেশ করলেন, ‘সুনন্দ, এই বামনের মস্তক মুণ্ডন করো।’

এইবার চন্দ্রগুপ্তর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সেই খর্বাকার জীবটি। তার মুখ থেকে খসে গেছে নিষ্পাপ মুখাবরণ। পরিবর্তে তার চোখ থেকে ঝরে পড়ছে জিঘাংসা আর ঘৃণার বিষদৃষ্টি। তার ওষ্ঠপ্রান্তে দুর্বোধ্য হাসি, শরীরী ভাষায় অবজ্ঞা আর ঔদ্ধত্য। হিসহিস করে সে বলে উঠল, ‘সাবধান হও চন্দ্রগুপ্ত! যদি চাও, এখনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারো। না হলে প্রভু পরমেশ্বর রুদ্রসিংহ কিন্তু তোমারও ওই অবস্থা করবেন যা আমরা ওই কবির করেছিলাম। তুমি তাই চাও? তুমি তোমার প্রেয়সী ধ্রুবাকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিতা হতে দেখতে চাও?

এখনও সময় আছে, প্রভুর শরণে এসো। প্রভু পরম দয়ালু, পরম কৃপাবান। তিনি চাইলেই তোমার জীবন দান করতে পারেন।'

চন্দ্রগুপ্ত কিছু বললেন না। কেবল তরবারিটি কোষমুক্ত করে নিস্পৃহস্বরে বললেন, 'সুনন্দ...'

সুনন্দ প্রস্তুত ছিল। সে বামনের মাথায় একঘটি জল ঢেলে মস্তক মুণ্ডন করা শুরু করল।

কুমার চন্দ্রগুপ্তর সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছে ক্রুদ্ধ কেশরীর মতো। চোখদুখানির প্রান্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, হনু সুকঠিন। তাঁর হস্তধৃত উন্মুক্ত তরবারির অগ্রভাগে ঝলসে উঠছে দীপ্ত সূর্যরশ্মি।

চন্দ্রগুপ্তর জানুদেশের সামনে একটি আনতশির মুণ্ডিত মস্তক। স্বাভাবিকের চাইতে ঈষৎ বৃহৎ সেই মস্তকটিতে অতি ক্ষুদ্রাকারে বহুতর বিচিত্র লিপি অঙ্কিত।

গ্রামবাসীরা স্তম্ভিত। চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে আসা বিশ্বস্ত প্রহরীরা বেষ্টন করে রেখেছে সমগ্র কুটিরপ্রাঙ্গণ। এমন স্তব্ধ সংশঙ্ক প্রহর বোধকরি এই গ্রামের ইতিহাসে পূর্বে কখনও আসেনি।

একটু পরেই কালি নেমে এলেন সেই প্রাঙ্গণে। বোধহয় এই অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য শঙ্কিত করেছিল তাঁকে। তিনি এসে সমগ্র পরিস্থিতি দেখলেন। তারপর সেই বামনের মুণ্ডিত মস্তকখানি নিরীক্ষণ করে বিস্মিতস্বরে বললেন, 'এসব কী সম্রাট?'

চন্দ্রগুপ্ত কঠিনস্বরে বললেন, 'এ একটি সাংকেতিক বার্তা কালি, একটি বিশিষ্ট সঙ্কেতলিপিতে লিখিত। এবং এই সঙ্কেতলিপি আমার বড় চেনা। পাটলিপুত্রর সমস্ত অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং রাজন্যবর্গকে এই সঙ্কেতলিপির প্রয়োগবিধি অধ্যয়ন করতে হয়। এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হলে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ শাসনবৃত্তে স্থান মেলে না।

'গুপ্তসাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ এক রাজসভাসদ এই উপায়ে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন সুহৃদ রুদ্রসিংহের কাছে। শুধু সেই সুহৃদ স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি যে তাঁর এই খর্বাকৃতি গূঢ়দূতটি কেবলমাত্র পছন্দের শস্ত্রীর লোভে এই গ্রামে এসে আমার হাতে ধৃত হবে।'

কালি আরও বিস্মিত হলেন, 'সাঙ্কেতিক বার্তা? কী লেখা আছে এই বার্তায়?'

কুমার চন্দ্রগুপ্তর ওষ্ঠপ্রান্ত সামান্য ব্যঙ্গকুঞ্চিত হল। তিনি বললেন, 'এখানে লেখা আছে কী করে সম্রাট রামগুপ্তকে এই পার্বত্যদেশে সপরিবার-সপার্ষদ বন্দী করতে হবে। এবং তারপরেই কীভাবে গুপ্তরাজলক্ষ্মীসহ সমগ্র গুপ্তসাম্রাজ্য রুদ্রসিংহের পদানত হবে।'

কালির মুখখানি কঠিন হল। তিনি বামনের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'কী রে বামন, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যা বলছেন সব সত্যি?'

মুখ তুলল সেই বামন। খানিক তাকাল চন্দ্রগুপ্তর দিকে। তারপর তার দৃষ্টি পড়ল কালির উপর। কালিকে দেখামাত্র তার চোখে ফুটে উঠল জিঘাংসু লোলুপ দৃষ্টি। স্খলিত কামুক স্বরে সে বলে উঠল, 'আহা, এ কোন কামিনী? যেমন রমণীয় শরীর, তেমন অনিন্দ্যসুন্দর মুখচন্দ্রিমা। একবার আমার সঙ্গে চল রে মেয়ে। মহারাজ রুদ্রসিংহ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। তাঁকে পতিত্বে বরণ করে সুখী হবি রে মেয়ে, মহারাজ তোকে সোনা-রূপায় ভরিয়ে দেবেন...'

কালি অকস্মাৎ চন্দ্রগুপ্তর হাত থেকে তরবারিটি ছিনিয়ে নিলেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যে একটি মসৃণ আঘাতে বামনের মুণ্ডখানি তার স্কন্ধচ্যুত করে বললেন, 'এ জন্মে তো নয়ই, জন্মজন্মান্তরেও তোর প্রভুর স্বপ্ন পূরণ হবে না রে ক্লীব।'

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রত্যেকে স্তম্ভিত, হতচকিত হয়ে গেলেন। কর্তিত মুণ্ডটি গড়িয়ে গড়িয়ে এসে থেমে গেল কুমার চন্দ্রগুপ্তর পায়ের কাছে। আর স্পন্দিত হতে থাকা দেহকাণ্ডটি থেকে রক্তের স্রোত পিচকিরির

মতো ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল কুটিরপ্রাঙ্গণ।

তবে সব কিছু ছাপিয়ে ভেসে এল গ্রামপ্রধানের আতঙ্কিত আর্তনাদ, 'ওরে নির্বোধ মেয়ে, এ কী করলি তুই! স্বয়ং কুমারের তরবারি দিয়ে...'

কুণ্ঠিতা কালি রক্তস্নাত তরবারিটি দুহাতে তুলে ধরে চন্দ্রগুপ্তর হাতে সমর্পণ করলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, 'মার্জনা করবেন সম্রাট। অধীনার ক্রোধ বড় তীব্র। সাময়িক উন্মত্ততার বশে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি।'

কুমার চন্দ্রগুপ্ত তরবারিটি কোষবদ্ধ করে বললেন, 'আপনি কোনও অপরাধ করেননি মা। এই মুণ্ডচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কেবল আমার পরিবর্তে আপনার হাতে হয়েছে, এই যা। আর ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনার মতো তেজস্বী নারীর পিতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।'

কালি অবনতমস্তকে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে প্রণাম করলেন।

সেইদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই প্রস্তুত হল কুমার চন্দ্রগুপ্তর ক্ষুদ্রবাহিনীটি। যত শীঘ্র সম্ভব তাদের ফিরে যেতে হবে সম্রাট রামগুপ্তর বিজয়শোভাযাত্রার প্রতি। ফিরে যেতে হবে আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কা নির্মূল করতে।

তবে তাদের সঙ্গে এইবার একজন সদস্য বেশি।

সেই কবিকে সঙ্গে নিয়েছেন চন্দ্রগুপ্ত। এই অসামান্য প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে পাটলিপুত্রের রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত করবেন তিনি। গ্রামপ্রধান এবং কালিকে কথা দিয়েছেন তিনি।

যাত্রা শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি কালিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই আমার এক অনুজ ভ্রাতা এখানে আসবেন কালি। তাঁর নাম কুমার কচগুপ্ত। তিনি আমার পরম অনুগত। তাঁকে আপনি সর্বান্তকরণে সাহায্য করবেন, এই প্রার্থনা করি।'

কালি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তারপর বিষণ্ণ হেসে কবির দিকে তর্জনী তুলে বললেন, 'ওঁকে আপনার হাতে দিলাম সম্রাট। দেখবেন, উনি যেন ওঁর প্রতিভার যোগ্য সম্মান পান।'

চন্দ্রগুপ্তর ইচ্ছা হল অশ্ব হতে অবতরণ করে একবার এই অসামান্যা নারীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। একই শরীরে এত কোমল প্রেম আর এত তেজোদৃপ্ত কাঠিন্য, এ শুধু নারীরাই পারে।

তিনি সস্নেহ হেসে বললেন, 'চিন্তা করবেন না মা। আমি মহারাজাধিরাজ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর সন্তান চন্দ্রগুপ্ত, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ইনি অবশ্যই এঁর প্রতিভার উপযুক্ত যশের অধিকারী হবেন। আর আপনার এতদিনের স্নেহপ্রেমচ্ছায়ার দাস হয়ে ছিলেন ইনি, তাই আমি আজ থেকে এঁর নামকরণ করলাম, কালিদাস। মহাকবি কালিদাস।'

উপত্যকার পথ ধরে অশ্বারোহীবাহিনী দ্রুত নেমে গেল সম্রাট রামগুপ্তর বিজয়শোভাযাত্রার উদ্দেশে। আর অনেক উপরে, পাহাড়ি পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে সেই অপসৃয়মান বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন এক শ্যামাঙ্গী নারী। তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা।

কে বলে দেবীরা কাঁদে না?

কয়েকদিন পরের কথা। রামগুপ্তর আদেশে শিবির সরে এসেছে কয়েক ক্রোশ উত্তরে, এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। এতদঞ্চলের যাবতীয় জনপদের মতো এই উপত্যকাটিও অতীব সুরম্য। কোমল ও মসৃণ হরিৎবর্ণ তৃণে সমগ্র ভূমিটি আচ্ছাদিত। তার মধ্যে মাথা তুলে আছে ছোট ছোট উজ্জ্বল ফুলেদের দল। আর এই নয়নাভিরাম ভূমিটির চারিধারে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী। তাদের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের

গরীয়ান তুষারশৃঙ্গগুলি। ঘনকৃষ্ণ রাত্রিতে যখন পূর্নিমার চন্দ্রালোক চারিদিকে এক অপার্থিব মায়াজ্যোৎস্নার অঞ্চল বিছিয়ে দেয়, তখন এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে সত্যই দেবতাদের রম্যভূমি বলে ভ্রম হতে থাকে।

এই উপত্যকায় প্রবেশ এবং নির্গমনের পথ একটিই। উপত্যকার অন্তিমদেশে একটি সরু গিরিখাত। চারিদিক বেষ্টন করে থাকা পর্বতশ্রেণি ওইখানে এসে উপত্যকার ভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সভ্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের পথ বা উপায় একটিই, ওই সঙ্কীর্ণ গিরিপথটি।

সম্রাট রামগুপ্তকে এই দেবভোগ্য ভূমির সন্ধান দিয়েছিল কয়েকদিন আগে তাঁর মনোরঞ্জন করে যাওয়া কিন্নরীটি। তাই তাঁরই ইচ্ছায় এখানে শিবির স্থাপন। সেই মোহময়ী নারী তাঁকে বলে গেছে এর আশেপাশেই তাদের বসতি। মহারাজ এখানে শিবিরস্থাপনা করলে সে নিত্যই উপস্থিত থাকতে পারবে মহারাজের সেবায়।

এখানে আসার পর প্রথম দুদিন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। তৃতীয়দিন সন্ধেবেলায় রামগুপ্ত আদেশ দিলেন উন্মুক্ত আকাশের নিচে, আগুন জ্বালিয়ে আমোদ-উল্লাসের আয়োজন করতে। সঙ্গে যেন অতীব উৎকৃষ্ট মাধ্বী, পৈষ্টী, উত্তমরূপে শূলপক্ক মৃগমাংসের আয়োজন থাকে।

সূর্যস্বামী ইতস্ততভাবে প্রশ্ন করলেন, ‘আর নৃত্যগীতের কী ব্যবস্থা করব প্রভু?’

‘সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না সেনাপতি।’ মুখের হাসিটি বিস্তৃত হল সম্রাটের, ‘কেন আগুন জ্বালাতে বলেছি জানো? সে বলে গেছে, এই আগুন দেখলে তারা নিজেরাই নাচতে নাচতে চলে আসবে, বুঝলে হে। আর আজ নাকি দুজন নয়, কমপক্ষে দশজন সুন্দরী আসছে আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য। হে হে হে। তুমি বরং দেখো মৃগমাংসটি ঠিক করে শূলপক্ক করা হচ্ছে কি না।’

এই বলে রামগুপ্ত তৃতীয় পাত্রটিতে চুমুক দিতে যাবেন, এমন সময় ঝড়ের মতো সেখানে প্রবেশ করলেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। এই প্রবল শৈত্যের মধ্যেও দরদর করে ঘামছেন তিনি। চোখমুখ অতিশয় উত্তেজিত। তিনি এসেই উচ্চৈস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘কে সেই মূর্খ, কার আদেশে শিবির সরিয়ে আনা হয়েছে এখানে?’

রামগুপ্ত প্রথমে সামান্য বিস্মিত হয়েছিলেন। কুমার সচরাচর তাঁর সামনে এমন ব্যবহার করেন না। তিনি ধমকে উঠলেন, ‘কাকে মূর্খ বলছ কুমার? নিজের ভাষা সংযত করো। আমি, আমিই বলেছি এখানে শিবিরস্থাপন করতে। কেন, তোমার আপত্তি আছে?’

রামগুপ্তর দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে রইলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। বোধকরি উদ্গত ক্রোধকে অতি কষ্টে সংবরণ করলেন। তারপর চেষ্টাকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, ‘মহারাজ, আপনি কি স্বেচ্ছায়, সব কিছু অবগত হয়ে এখানে শিবির সরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন?’

ভ্রুকুঞ্চন করে সম্রাট বললেন, ‘কেন, তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি?’

‘আপনি কি জানেন আমরা কোথায় আছি?’

‘কুমার, তুমি কি সিংহাসনের অধিকার হারিয়ে হতাশায় অন্ধ হয়েছ? দেখছ না কী সুরম্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যে...’

‘ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন সম্রাট,’ সম্রাটের কথার মধ্যেই কথা বলে উঠলেন চন্দ্রগুপ্ত, ‘আমি না নয় হতাশায় অন্ধ, কিন্তু আপনার অমাত্যরা তো চক্ষুষ্মান। আপনার সেনাপতি তো দিব্যচক্ষুর অধিকারী। তাঁরা আপনাকে জানাননি যে এখান থেকে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে ভীমনগর দুর্গ, আর শকাধিপতি রুদ্রসিংহ এখন সেখানে সসৈন্যে অবস্থান করছেন?

সভার মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সবাই চন্দ্রগুপ্তর দিকে স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলেন। শিখরস্বামী বলে উঠলেন, ‘কী বলছেন কী কুমার?’

‘আমি ঠিকই বলছি মহামন্ত্রী। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি রুদ্রসিংহের কাছে আমাদের এই পার্বত্যপ্রদেশে শিবিরস্থাপনার সংবাদ পৌঁছেছে। তারপরেই সে শুরু করেছেন তার চক্রান্তের জাল বোনা। সে জানে

সম্মুখসমরে অজেয় গুপ্তসেনানীদের পরাভূত করা অসম্ভব। তাই সে কাপুরুষের মতো এই পন্থা বেছে নিয়েছে।'

বলেই তিনি মহামাত্য শিখরস্বামীর দিকে ফিরলেন, 'আমি সূর্যস্বামীকে বলেছিলাম শকরাজের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য গূঢ়পুরুষদের নিয়োগ করতে। তার কী হল?'

সূর্যস্বামী বিহ্বল চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন। তাঁর কোমল গণ্ডদেশ ইতিমধ্যেই লজ্জায় রক্তিম। পরিবর্তে তাঁর পিতা উত্তর দিলেন, 'সূর্য কোনও গুপ্তচর পাঠায়নি যুব...কুমার চন্দ্রগুপ্ত!'

'কেন? আমার আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা হল কী করে সূর্যস্বামীর?' গর্জে উঠলেন চন্দ্রগুপ্ত। রাজসভাসদরা সামান্য কেঁপে উঠলেন সেই গর্জনে।

'কারণ আমাদের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচরেরা এখন মালবদেশে নিয়োজিত, কুমার।' মাথা নীচু করে উত্তর দিলেন শিখরস্বামী।

দাঁতে দাঁত ঘষলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'উত্তম, অতি উত্তম। আমাদের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচরেরা এখন পট্টমহিষীর পিতৃভূমিতে, তাঁরই পিতার গতিবিধির লক্ষ্য রাখার কাজে নিয়োজিত। তার কারণ আপনারা মনে করেন যে কন্যার সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন মালবরাজ পাটলিপুত্র আক্রমণ করতে পারেন। তাই তো?'

সভাস্থল নিস্তব্ধ।

ক্রুদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত ভীমনাদে চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনাদের কোনও ধারণা আছে আপনাদের এই অবিমৃশ্যকারিতার কী চরম দণ্ড দিতে হতে পারে আমাদের? সূর্যস্বামীর এই অপরিসীম মূর্খতা আমাদের কোন ঘোর বিপদের সামনে এনে ফেলেছে?

রামগুপ্ত বিরক্ত এবং ঈষৎ স্খলিতস্বরে বললেন, 'তুমি নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন কোরো না কুমার। কে রুদ্রসিংহ? কত ক্ষমতা ধরে সে? আমাদের সঙ্গে এই যে সুবিশাল এবং সুশিক্ষিত সৈন্যদল রয়েছে তার সামনে এই রুদ্রসিংহ আর তার সৈন্যদল এমন কী? তাদের মূষিকের মতো পিষ্ট করতে কত সময় লাগবে? আর এই সৈন্যদল চালনার জন্য সূর্যস্বামী আছে। সর্বোপরি আমি রয়েছি। তুমি কি আমার বীরত্বে সন্দেহ প্রকাশ করছ কুমার?'

'না মহারাজ। আপনার বীরত্বে সন্দেহ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে দেখুন। আমরা এমন একটি উপত্যকার মধ্যে রয়েছি যার চারিপাশে পর্বতশিখর। সেখান হতে আমাদের লক্ষ্য করা অত্যন্ত সহজ। আপনি নিজে পাটলিপুত্রের শ্রেষ্ঠতর যুদ্ধবেত্তাদের মধ্যে একজন। আপনি জানেন রণাঙ্গনে উচ্চভূমিতে অবস্থানের কৌশলগত সুবিধাগুলি কী কী।

'তার ওপর দেখুন, এইখান থেকে নির্গত হওয়ার একটিই পথ, ওই সঙ্কীর্ণ গিরিখাতটি। রুদ্রসিংহ যদি কোনওক্রমে ওই গিরিখাত বন্ধ করতে পারে, তাহলে সে নয়, আমরাই মূষিকের মতো এখানে পিষ্ট হব মহারাজ।'

প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চন্দ্রগুপ্ত ক্রুদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি করতে লাগলেন। ভীত এবং উৎকণ্ঠিত অমাত্যবর্গ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। কারও মুখে কোনও কথা জোগালো না।

কিছু পর তিনি বললেন, 'আজ এখানে আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ উৎসবের আয়োজন কেন করা হচ্ছিল জানতে পারি?'

শিখরস্বামী যতটা সম্ভব ততটা সংক্ষিপ্ত করে সেই নৃত্যগীতপটু যুগলের কথা বললেন। 'তাদের নৃত্যপরিবেশনা এবং সঙ্গীতপারদর্শিতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম কুমার। তারাই আমাদের এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানায়।'

শোনামাত্র আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত, 'সর্বনাশ, তারা অবশ্যই রুদ্রসিংহের প্রেরিত গুপ্তচর। আর আমরা নিতান্ত মূর্খের মতো তাদের ফাঁদে পা দিয়ে, তাদের আমন্ত্রণে এই মৃত্যুপুরীতে

শিবিরস্থাপন করে, আগুন জ্বালিয়ে আমাদের আগমনসংবাদ আমরাই জানিয়েছি তাদের। অসাধারণ! অনবদ্য!'

সূর্যস্বামী ভীতস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে...'

'তার আর কোনও মানে নেই সূর্যস্বামী। খুব সম্ভবত রুদ্রসিংহের রুদ্রবাহিনী এই পথেই ধেয়ে আসছে আমাদের সমূলে বিনাশ করবে বলে। আজই সেই রাত্রি। হয়তো আর কিছুক্ষণ...কুমার কচ কোথায়?'

কুমার কচ হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। তিনিও সংবাদ পেয়েছেন যে তাঁর প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। কচের মনে ভাবনা দুর্ভাবনার বিচিত্র সব খেলা চলছিল।

চন্দ্রগুপ্ত প্রাণপ্রিয় এবং অনুগত অনুজটিকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'শোনো কচ, আজ আমি তুমি এবং সমগ্র গুপ্তসাম্রাজ্য ঘোর বিপদের সম্মুখীন। যদি প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে হয়তো আজ রাত্রির মধ্যেই পিতা পিতামহের স্থাপিত এই মহান সাম্রাজ্য সমূলে বিনষ্ট হবে। আমার আশঙ্কা, হয়তো আজ রাত্রির মধ্যেই রুদ্রসিংহের বাহিনী আমাদের আক্রমণ করবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে, এই অল্পসময়ের মধ্যে এই শিবির অন্যত্র সংস্থাপন করা সম্ভব নয়।

'কিন্তু আমরা মহারাজ সমুদ্রগুপ্তর সন্তান। বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেওয়া আমাদের রক্তে নেই।

'তুমি এখনই তোমার বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের একটি দল গঠন করে ভীমনগরের দিকে দ্রুত রওনা দাও। পথিমধ্যে একটি গ্রাম পড়বে। তার পথনির্দেশ এই পত্রে লিখে দিলাম। সেখানে পৌঁছে গ্রামপ্রধান এবং তাঁর কন্যা কালির সঙ্গে দেখা করবে। সেখানে কেউ যেন তোমাদের দেখে না ফেলে। কালি তোমাদের এক দুদিন লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি সেখানে পৌঁছে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আমার বার্তার জন্য অপেক্ষা করবে, বুঝেছ? আমি আবারও বলছি, আমার সঙ্কেত ভিন্ন কোনও অবস্থাতেই ভীমনগর দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করবে না। প্রচ্ছন্নভাবে থাকবে, আমার সঙ্কেতের অপেক্ষা করবে। আমার সঙ্কেত তো তুমি জানো।'

কচ ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু কালি কী করে বুঝবেন আমি আপনার পক্ষ হতে প্রেরিত?'

চন্দ্রগুপ্ত মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে শুধু বলবে, "আপনার দাস সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আপনার সন্তান আমাকে পাঠিয়েছেন মা।" আমি যেভাবে বললাম, ঠিক সেইভাবেই বলবে। দেখবে, ওখানে থাকতে তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না।'

কচ কিছু বুঝলেন না বটে, তবে তিনি কম কথার মানুষ। পথনির্দেশটি হস্তগত করে তিনি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

চন্দ্রগুপ্তর আশঙ্কাই সত্যি হল। কুমার কচ প্রস্থানের কয়েক দণ্ডের মধ্যে, মধ্যরাত্রেই চারিপাশের পর্বতচূড়া ঘিরে এক এক করে মশালের আগুন দেখা দিল। নিকষ কালো রাত্রির বুক চিরে সেই অগ্নিপিণ্ডগুলি বয়ে নিয়ে এল এক অজানা অশনিসম্পাতের সঙ্কেত।

রামগুপ্ত বুঝলেন, গুপ্তরাজন্যবর্গ বুঝলেন, তাঁদের পরিবারবর্গ বুঝলেন রুদ্রসিংহের সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলেছে তাঁদের। প্রতিটা তরবারি, ভল্ল এবং তিরের নিশানা তাঁদেরই দিকে। তাঁরা এখন শকাধিপতির সহজ শিকার বৈ আর কিছু নয়।

গুপ্ত সেনাবাহিনী প্রস্তরবৎ স্থির। তারা রণকুশল যোদ্ধৃজাতি। যে-কোনও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পড়ে নিতে তাদের মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। তারা জানে যে এই মুহূর্তে তাদের পক্ষ থেকে সামান্য আলোড়নও তাদের সামূহিক গণহত্যার দিকে চালিত করবে।

আর শক বাহিনীও জানে, নেহাত গণ্ডমূর্খ না হলে গুপ্তদের পক্ষ থেকে কেউ এই মুহূর্তে বিরোধিতা করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না। কারণ উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, এই অনুচ্চ পর্বতশ্রেণীর শিখর হতে ধাবমান সূচীমুখ শরবর্ষণের সামসাসামনি হওয়া আর মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া একই ব্যাপার। সৈন্যের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু সম্মানের বটে, কিন্তু যুদ্ধজয় অনেক বেশি গৌরবের। সৈনিক যুদ্ধ করে শত্রুনিপাত করার জন্য, আত্মহত্যা করার জন্য নয়।

সম্রাটের শিবিরের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ চলছিল। যাঁরা যুদ্ধজীবী নন, তাঁরা প্রবলভাবে যুদ্ধের পক্ষে। যাঁরা জন্মেছেন এক হাতে কুঠার অন্য হাতে তরবারি নিয়ে, তাঁর কূটনীতির কথা তুলছেন।

সমাহর্তা রুদ্রপাল বললেন, 'এখনই এই কাপুরুষদের প্রত্যাঘাত করে সমুচিত উত্তর দেওয়া হচ্ছে না কেন সম্রাট?'

সূর্যস্বামী অপদার্থ হলে কী হবে, রণনীতির প্রাথমিক জ্ঞানটুক অন্তত রাখেন। তিনি তিক্তস্বরে বললেন, 'যে বিষয় জানেন না, বোঝেন না, সেই বিষয়ে দয়া করে মতামত দিতে যাবেন না রুদ্রপাল। এই মুহূর্তে সমুচিত উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা যেআত্মহত্যার সমতুল, মসীজীবী করণিক না হলে সে কথা আপনিও বুঝতেন রুদ্রপাল।'

শিখরস্বামীর কথা শুনে রুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ালেন অন্তরবানিশিক, প্রদেষ্টা, পৌরব্যবহারিক এবং সন্নিধাতারা। সন্নিধাতা শান্তবুদ্ধি, তীব্রস্বরে বললেন, 'আপনি যখন এতই বোঝেন সেনাপতি মহোদয়, এখানে শিবির সংস্থাপনের পূর্বে এই আসন্ন বিপদের ব্যাপারে সম্রাটকে অবহিত করেননি কেন?'

প্রদেষ্টা দিব্যধনু বয়সে যুবক। যৌবনের রক্ত সদাসর্বদাই কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়। তিনি তীব্রস্বরে বললেন, 'আমাদের চতুর সেনাপতি মহোদয়ের বুদ্ধির দৌড় তো দেখাই যাচ্ছে। এই বিপদের মধ্যে আমাদের এনে ফেলার সিদ্ধান্ত কোন মসীজীবী করণিক নিয়েছিলেন জানতে পারি?'

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দনুজদমন। প্রাজ্ঞ এই মানুষটিকে প্রত্যেকে সম্মান করেন। দনুজদমন বললেন, 'এখন নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদের ব্যাপৃত হওয়ার সময় নয়। এই মহাবিপদ হতে কীভাবে আমরা রক্ষা পেতে পারি, সেই উপায়ে আলোচনা হোক।'

অন্তরবানিশিক বুদ্ধদাস প্রবীণ অমাত্য। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় বিপক্ষের কাছে আমাদের দূত প্রেরণ করা উচিত। অনর্থক লোকক্ষয় এড়ানোই আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।'

চন্দ্রগুপ্ত শিবিকায় প্রবেশ করলেন, গম্ভীরস্বরে বললেন, 'তার আর প্রয়োজন হবে না। শকাধিপতি রুদ্রসিংহ দূতের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন। শকদূত শিবিকার বাইরে অপেক্ষা করছে।'

মহারাজ দূতকে ভিতরে আসতে বলার ইঙ্গিত করছিলেন বটে। কিন্তু তার আগেই শিখরস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদেশ দিন মহারাজ, এই সংবাদবাহকের সঙ্গে আমি একান্তে দেখা করে রুদ্রসিংহের প্রস্তাব শুনতে চাই।'

মহারাজ বেপথু। তিনি নির্লিপ্তসুরে বললেন, 'তাই যান মহামন্ত্রী। দেখুন রুদ্রসিংহ কী চায়। যা চায়, দিয়ে এই অর্বাচীনকে বিদায় করুন।'

শিখরস্বামী প্রস্থান করতেই শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করলেন পট্টমহিষী ধ্রুবা। উত্তেজিত এবং বিচলিতস্বরে বললেন, 'এইভাবে এখানে আসার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী মহারাজ। কিন্তু সংবাদ পেলাম আমরা নাকি আক্রান্ত। রুদ্রসিংহের সৈন্যরা চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমি আর থাকতে না পেরে উপস্থিত হলাম।'

উপস্থিত সভাসদরা উঠে দাঁড়িয়ে মহাদেবীকে অভিবাদন করলেন। তারপর সূর্যস্বামী তাঁকে পরিস্থিতি সংক্ষেপে জানালেন। ধ্রুবার মুখ ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং উৎকণ্ঠায় বক্রভাব ধারণ করল। তিনি একপাশে উপবেশন করলেন।

কিছুক্ষণ পর মহামন্ত্রী শিখরস্বামী প্রায় দৌড়ে প্রবেশ করলেন শিবিরে, 'অসম্ভব, এ অসম্ভব! এই দুরাত্মার এত বড় স্পর্ধা যে...' বলতে বলতেই রাজমহিষীকে দেখে থেমে গেলেন তিনি। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, সেনাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির আদেশ দিন। এই শর্ত মেনে নেওয়ার থেকে আত্মহত্যা করা শ্রেয়।'

রামগুপ্ত অর্ধনিমীলিত চোখে বললেন, 'কেন মহামন্ত্রী? এমনকী শর্ত দিয়েছে রুদ্রসিংহ যে তোমার পক্ষে আত্মহত্যা করা শ্রেয় বলা মনে হচ্ছে? যাই হোক, সে শর্ত দ্রুত পালন করো আর এই উৎপাতকে অতিশীঘ্র বিদায় করো। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছি এবার।'

শিখরস্বামী শান্ত মস্তিষ্কের মানুষ। স্থিরবুদ্ধির কূটনীতিজ্ঞ বলে এই সসাগরা জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধি আছে তাঁর। সেই তিনি প্রবল ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মহারাজাধিরাজের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে স্বভাববিরুদ্ধভাবে গর্জে উঠলেন গুপ্তবংশের অনেক সুখদুঃখের সঙ্গী সেই প্রাজ্ঞ মানুষটি, 'রামগুপ্ত, এ অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডার সময় নয়। শুধুমাত্র এই সাম্রাজ্যের মহামন্ত্রী বলে নয়, তোমার পিতার বয়স্য বলে নয়, গুপ্তবংশের বশংবদ ভৃত্য বলে নয়, আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে বলছি, পূর্ণরূপে সজাগ হও। আজ আমরা যে সঙ্কটের সম্মুখীন তা শুধু গুপ্তবংশ নয়, তোমার সম্মানও ক্ষুণ্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

মহামন্ত্রী অদ্যাবধি রামগুপ্তকে প্রকাশ্যে কখনও তুমি সম্বোধন করেননি। তাই সভাসদরা সচকিত হলেন। আবেশাতুর রামগুপ্ত চোখ মেলে চাইলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

নিজেকে সংযত করলেন শিখরস্বামী, তারপর কম্পিতস্বরে বললেন, 'অধীনের ক্ষণিকের প্রগলভতা মার্জনা করবেন মহারাজ। কিন্তু পরিস্থিতি আজ সত্যই সঙ্গিন। আজ আপনাকে আমার কথা শুনতেই হবে, রাজকীয় সম্বোধনে নষ্ট করার মতো সময় নেই! পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত জটিল।'

রামগুপ্তর শ্লেষাত্মক কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'যদি এই জটিল পরিস্থিতি সামলাতেই না পারো, তাহলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি কেন মহামন্ত্রী?' রামগুপ্তের কথা জড়িয়ে আসছে। দুটি চোখ অর্ধনিমগ্ন 'আমাকে বিরক্ত কোরো না, সাম্রাজ্যের জন্য, গুপ্তবংশের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত মনে হয় এমন সিদ্ধান্তই নেবে। ওরে কে আছিস, মাধ্বীকের কলসটা এদিকে দিয়ে যা।'

মহামন্ত্রীকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করলেন, আমি আমার কর্তব্য বিষয়ে সম্যকরূপে অধিগত মহারাজ। কিন্তু...কিন্তু...এই রুদ্রসিংহ এক অত্যন্ত কুৎসিত, অত্যন্ত ইতরজনোচিত প্রস্তাব জানিয়েছে। আমরা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারি না।'

'তাহলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো। কিন্তু আমাকে বিরক্ত কোরো না। ওরে, মাধ্বীকের কলসটা যে এখনও...'

'আপনি বোধহয় পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্যকরূপে অবহিত নন সম্রাট। আমরা ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অবস্থায় নেই। ওরা আমাদের ঘিরে রেখেছে মহারাজ। নিষ্ক্রমণের পথ নেই, আমরা এখন ওদের ক্ষমার ওপর নির্ভরশীল।'

'আহ, বড় অর্থহীন বাগাড়ম্বর করো মহামন্ত্রী। যা বলতে চাও, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দূর হও দেখি! আমি আপাতত শান্তিতে থাকতে চাই।'

শিখরস্বামীর উদ্ভ্রান্ত মুখ দেখে সভাসদরা আরও বিচলিত হলেন। তিনি শান্তধীরবুদ্ধির মানুষ হিসেবে সুখ্যাত। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত রাজন্যদের অবস্থা আরও সঙ্গিন হল।

শিখরস্বামীর অবস্থাও তদ্রুপ। তিনি নিরুপায় হয়ে মহাদেবী ধ্রুবার দিকে তাকালেন। ধ্রুবাকে দেখে মনে হল দানবপীড়িত ইন্দ্রসভার মাঝে, তিনি পাষাণ প্রতিমার মতো বসে। শিখরস্বামীকে তিনি কথা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন।

'রুদ্রসিংহ বলেছেন, এই মুহূর্তে আমরা তাঁর তরবারির অগ্রভাগে অবস্থান করছি। চাইলেই তিনি আজ গুপ্তবংশ নির্বংশ করতে পারেন।'

'বটে? গর্ভস্রাবটার এত সাহস?'

'তিনি দুটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন মহারাজ। এক, গুপ্তরা যদি উত্তর পশ্চিমে তাদের দাবি ত্যাগ করে, তবেই এই অবস্থা থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দেবেন। এবং...' এত পর্যন্ত বলে ইতস্তত করতে থাকেন শিখরস্বামী, তাঁর মুখে কথা জোগায় না।

'আহ, থামলে কেন, বলে যাও!' স্খলিতস্বরে বলে উঠলেন রামগুপ্ত। তাঁর কণ্ঠে নিস্পৃহ অধৈর্য।

‘এবং রুদ্রসিংহের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে মহাদেবী ধ্রুবাকে তাঁর রক্ষিতা হিসাবে ভীমনগর দুর্গে প্রেরণ করতে হবে...’ বলতে বলতে স্বর থেমে গেল মহামহিমান্বিত গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শিখরস্বামীর।

সভার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মহাদেবী ধ্রুবা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর অবগুণ্ঠন এখন ভূলুণ্ঠিত। অসহ্য ক্রোধে সর্বশরীর কাঁপছে তাঁর, চোখে যেন সর্বগ্রাসী অগ্নিস্রোত। নিজের দু-কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। তিনি কী শুনলেন? এই অসহনীয় অপমানও প্রাপ্য ছিল তাঁর?

অন্য সভাসদরা প্রস্তরবৎ স্তম্ভিত। মুহূর্তের মধ্যে ক্রুদ্ধ কেশরীর মতো উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রগুপ্ত। শরীরের পেশীগুলি ফুলে উঠেছে তাঁর।

স্বামী রামগুপ্তের দিকে ফিরে তাকান ধ্রুবাদেবী। গুপ্তসম্রাট রামগুপ্ত এখন মহামাত্য শিখরস্বামীর দিকে ভ্রু কুঞ্চিত করে চেয়ে রয়েছেন। অমাত্যদের চোখ সম্রাটের দিকে, মুখগুলি উত্তেজিত এবং গম্ভীর।

‘হুম! আর সেনাপতি শিখরস্বামী, তুমি কী বলো?’

‘মহারাজ, এই উপত্যকাটি এমন, যে শক বাহিনী আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। পালাবার কোনও পথ নেই। এখন বিরোধিতা করতে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু...’

পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে সকলেই। শিবিরের অভ্যন্তরে এখন মৃত্যুর নীরবতা।

একমাত্র রামগুপ্তকেই দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনও কিছুতেই বিচলিত নন। হাতের ইশারায় ভৃত্যকে আরও কিছুটা সুরা আনার আদেশ দিলেন।

‘তাহলে আর কী, উত্তর আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। আর কোনও উপায় না থাকলে, নিয়ে আসুন চুক্তিপত্র, আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।’

‘কিন্তু মহারাজ,’ বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী কথা হারিয়ে ফেললেন, ‘মহাদেবী...’

‘শাস্ত্রে বলে সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তাছাড়া মহাদেবী পতিব্রতা নারী। নিজের স্বামীর প্রাণ রক্ষা করাই তো তাঁর কর্তব্য।’

মুহূর্তের মধ্যে তরবারির কোষে হাত চলে গেল চন্দ্রগুপ্তর। অসহ্য ক্রোধে কে যেন চিৎকার করে উঠলেন অমাত্যদের মধ্যে। এর থেকে গাঢ়তর তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কখনও এসেছে গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাসে?

প্রতিটি চোখ এখন ধ্রুবার দিকে নিবিষ্ট। ক্রোধে, অপমানে প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তাঁর।

‘মহারাজ, এ ঘোর পাপাচার আপনি করতে পারেন না।’ এই প্রথম কথা বললেন চন্দ্রগুপ্ত। মনে হল যেন বহু কষ্টে কথাগুলি উচ্চারিত হল তাঁর মুখ থেকে, ‘এই অন্যায়, এই অপমান সহ্য করা আপনাকে শোভা দেয় না।’

‘আহ, তুমি চুপ করো চন্দ্র। স্বামী-স্ত্রীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে এসো না।’

চন্দ্রগুপ্ত প্রত্যুত্তর করার আগেই মুখ খুললেন ধ্রুবা, তাঁর স্বরে যে উদগ্র অসহায় ঘৃণা প্রকাশ পেল, তার বুঝি তুলনা নেই।

‘মহারাজ, আপনি না আমার স্বামী? আপনি অগ্নি সাক্ষী করে আমাকে বিবাহ করার সময় শপথ করেছিলেন না, যে আজীবন আমায় রক্ষা করবেন?’

উঠে বসার চেষ্টা করলেন রামগুপ্ত। দুবারই পড়ে গেলেন। তৃতীয় বারের চেষ্টায় খানিকটা উঠে বসতে পারলেন। তারপর কণ্ঠস্বরে সামান্য স্নেহ মিশিয়ে বললেন, ‘প্রিয়তমা, তোমার স্ত্রীধর্ম অনুযায়ী তোমার উচিত সর্বোতভাবে নিজের পতিপরমেশ্বরের কল্যাণকামনা করা। কল্যাণী, এই তোমার ভবিতব্য। তুমি যে তোমার স্বামীর জীবনরক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছ, এটাই তোমার সৌভাগ্য!’

ধ্রুবা সম্পূর্ণ মূক এবং স্থবির হয়ে গেলেন। তিনি এমন আঘাত জীবনেও পাননি। তাঁর স্বামী ক্লীব, কাপুরুষ, নীচ এসব তিনি তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে এতটা অধোগামী এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর

ছিল।

‘স্বামী!’ ধ্রুবার কণ্ঠে অসহায় আর্তনাদ অনুরণিত হল, ‘আপনি এ কথা বলতে পারলেন? আপনি না আমার স্বামী? আমার রক্ষাকর্তা? নিজের স্ত্রীকে শত্রুর হাতে যৌনদাসীরূপে তুলে দিতে আপনার সঙ্কোচ হবে না? আপনার বিবেকে বাধবে না?’

রামগুপ্ত স্পষ্টতই বিরক্ত, ‘আহ! কেন বুঝছ না, এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।’

‘হ্যাঁ আছে,’ শিবিরের অন্য প্রান্ত থেকে তরবারি কোষমুক্ত করার শব্দ শোনা গেল। সকলে সভয়ে দেখলেন মহাবীর চন্দ্রগুপ্তর হাতে তাঁর ভয়াল খড়্গ, ‘মহাদেবীর অপমান মানে গুপ্তসাম্রাজ্যের অপমান, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর উত্তরাধিকারের অপমান। বেঁচে থাকতে এই অসম্মান আমি হতে দেব না মহারাজ।’

রামগুপ্ত সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ‘কে আছো, বাঁচাও! এই দেখো, আমার ভাই আমাকে হত্যা করতে চাইছে!’

কিন্তু আর্তনাদে কেউ সাড়া দিল না। কোষমুক্ত তরবারি হাতে চন্দ্রগুপ্তকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা আর স্বয়ং যমরাজকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ জানানো একই ব্যাপার।

বস্ত্রাবাসের দ্বারের কাছ থেকে কে যেন ধমকে উঠলেন, ‘চন্দ্রগুপ্ত, তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? সিংহাসনের লোভ কি তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে? ভ্রাতৃহন্তা হতে চাও?’

রাজমাতা দত্তাদেবী এসে দাঁড়ালেন দুই ভ্রাতার মধ্যে। রামগুপ্ত বলে উঠলেন, ‘দেখুন রাজমাতা, দেখুন। আপনাকে বলেছিলাম না, মহাদেবী আর চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে? এই দেখুন তার প্রমাণ। ক্ষমতা আর নারীমাংসের লোভে কুমার উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাকে হত্যা করতে চায় সে। ওই পাপিষ্ঠা কুলটা নারীই এর কারণ। করুক, রুদ্রসিংহ ভোগ করুক ওকে, সেই ওর উচিত শাস্তি হবে।’

মহাসর্বনাশের অনেক ওপার থেকে শ্মশানের হাহাকারের মতো এই শব্দগুলি ভেসে এল। সভাসদরা চোখ বন্ধ করলেন। এই কুবাক্য শোনার দুর্ভাগ্য যে হতে পারে, এ তাঁদের কল্পনাতেও ছিল না।

‘সাবধান, চন্দ্রগুপ্ত!’ রাজমাতা কঠিনস্বরে বললেন, ‘বিস্মৃত হয়ো না, মহারাজের বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিয়েছ তুমি।’

তরবারি কোষবদ্ধ করলেন চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শান্তস্বরে বললেন, ‘মা, আপনি কি জানেন যে শকাধিপতি রুদ্রসিংহ সন্ধির শর্তস্বরূপ গুপ্তবংশের রাজলক্ষ্মীকে রক্ষিতারূপে চেয়েছে? আপনি কি জানেন যে সম্রাট এই প্রস্তাবে সহমত জানিয়েছেন?’

‘এ-কথা কি সত্য, পুত্র?’ দত্তাদেবী ভ্রুকুঞ্চন করে মহারাজ রামগুপ্তর দিকে তাকালেন।

‘আমরা এখন বস্তুতপক্ষে ওদের হাতে বন্দী রাজমাতা। এই শর্ত পালিত না হলে সে আমাদের সকলকে হত্যা করবে। ধরিত্রীর বুক থেকে গুপ্তবংশের নাম মুছে যাবে। আপনি বলুন, এক্ষেত্রে আমি আর কী-ই বা করতে পারি?’ রামগুপ্তের গলায় আকুতি ফুটে উঠল।

দত্তাদেবী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর গম্ভীরমুখে বললেন, ‘গুপ্তরাজবংশের ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমাদের সবার প্রথম কর্তব্য। মহাদেবী আসবেন যাবেন, কিন্তু এই বংশের উত্তরাধিকার ধ্বংস হতে দেওয়া চলবে না।’

চন্দ্রগুপ্ত দীর্ঘশ্বাস টানলেন, যেন প্রবল আক্রোশে এখনই বিস্ফোরিত হবেন। কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগেই মহাদেবী তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন, ‘তবে তাই হোক। আমি রুদ্রসিংহের রক্ষিতালয়ে যেতে স্বীকৃত হলাম। এমন পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার থেকে, এমন বংশের কুলবধূ হওয়ার থেকে মৃত্যুও শ্রেয়।’

ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে। চারিপাশে অন্ধ পর্বতশ্রেণী নির্বাক বিস্ময়ে দেখে যাচ্ছে করুণগম্ভীর নাটিকাখানি। শীতল বাতাসে কার যেন অসহায় দীর্ঘশ্বাস। নিভন্ত আগুনের আলোয় ভূতগ্রস্তের মতো বসে বা দাঁড়িয়ে আছে কতগুলি ছায়ামূর্তি। কতগুলি মূঢ়, ম্লান, মূক ছায়ামূর্তি।

সেই আধো অন্ধকারে পুনরায় ধ্রুবার স্বর শোনা গেল, 'একটি মাত্র অনুরোধ আছে রাজমাতা। আশা করি গুপ্তবংশের মহাদেবীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার অনুমতি আপনি দেবেন।'

কেউ কোনও কথা বললেন না।

'আমাকে রুদ্রসিংহের হাতে যেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত নিজহস্তে সমর্পিত করেন। আমার এই অন্তিম কামনাটুকু রক্ষা করতে দিন।'

নিভন্ত সেই আগুন একেবারেই নির্বাপিত হল।

মহাদেবীর চতুর্দোলাযাত্রা চলেছে। চলেছে পাহাড়ি পাকদণ্ডী ধরে, মেঠো পথের ধুলো উড়িয়ে, খরবেগা কলস্বিনীর পাশ দিয়ে। চলেছে ভীমনগর দুর্গের দিকে।

ইতিমধ্যেই এই বার্তা ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। দলে দলে লোক ভিড় করে দেখতে এসেছে কীভাবে গুপ্তবংশের পট্টমহিষী স্বেচ্ছায় অন্য এক রাজার রক্ষিতা হতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই বিপুল অপমানের সাক্ষী হতে চায় তারা।

এই অঞ্চলের নারীরা পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং স্বভাবে স্বতন্ত্রা। তারা চাইলে অযোগ্য পতির কাছ থেকে মোক্ষ নিতে পারে। তারা উচ্চস্বরে কটুবাক্য বর্ষণ করছে রুদ্রসিংহের প্রতি, সম্রাট রামগুপ্তর প্রতি এবং গুপ্ত বংশের প্রতি। নারীর অপমান নারীদের বুকে না বাজলে আর কার বুকে বাজবে?

চতুর্দোলাসারির মধ্যে সাতটি চতুর্দোলা রয়েছে। তারমধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেটি মধ্যস্থলে। তাতে রয়েছেন স্বয়ং মহারানি ধ্রুবা। অন্যান্যগুলিতে তাঁর পরিচারিকা এবং কিঙ্করীরা রয়েছে। চতুর্দোলা নিয়ে চলেছে গুপ্ত সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্র দল। তবে তারা নামেই সৈন্য। তাদের খর্ব আকৃতি আর ক্ষীণকায় দেহ দেখে বোঝা যায় যে তারা ভারবাহী সৈনিক মাত্র, গৌরবার্থে সৈন্যদলের অভিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে শকপ্রহরীদের একটি শ্রেণীদল। তাদের আকার বিশাল, মুখ রুক্ষ ও কঠোর এবং প্রত্যেকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। দেখলে মনে হয় যেন শুক্রাচার্যের বরে পুনর্জীবিত রাক্ষসসৈন্যের দল এগিয়ে চলেছে।

একটু পরেই গুপ্তপ্রহরীদের মধ্যে একজন গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। সে বোধহয় পূর্বী দেশের লোক। সেই গানের ভাষা অজানা, সে সুর বিরহ, দুঃখ এবং বিষণ্ণতার সুর। শুনলে মনে হয় যেন কোনো নারী বিবাহের পর তার পিতৃগৃহ ছেড়ে, প্রেমাস্পদকে ছেড়ে অন্য দেশে যাচ্ছে। সে সুর শুনলেই মনের মধ্যে ভারি কষ্ট হতে থাকে।

আস্তে আস্তে অন্য গুপ্তপ্রহরীরাও তার সঙ্গে সুরে সুরে গান গাইতে শুরু করল। একটু পর দেখা গেল স্থানীয় জনগণ, যারা চতুর্দোলাযাত্রা দেখতে এসেছিল, তাদের মধ্যেও অনেকেই এই গান জানে, তারাও গলা মেলাল।

তার পর গুপ্তরক্ষীদের সুরে সুর মেলানো স্থানীয়রাও চতুর্দোলাযাত্রার সঙ্গে চলতে লাগল। শকসৈন্যদের দলপতি ধমকে উঠলেন, 'এ কী, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

স্থানীয়দের মধ্যে একজন আভূমিপ্রণত হয়ে বলল, 'আমরাও ভীমনগর যাচ্ছি প্রভু। এতটা পথ একলা যাব, কোথায় কোন বিপদ ওঁৎ পেতে আছে জানি না। আপনাদের সঙ্গে গেলে একটু বলভরসা পাই।'

সেনাপ্রধান আপত্তি করলেন না। স্থানীয়রা আবার গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে শকসৈন্যদের সঙ্গে চলতে লাগল।

তাদের মধ্যে দুজন হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল ধ্রুবার চতুর্দোলার ঠিক পেছনের চতুর্দোলাটির পাশে। সেখান থেকে একটি হাত বেরিয়ে এসে কিছু একটা গুঁজে দিল তাদের মধ্যে একজনের হাতে। দুজনে গান

গাইতে গাইতে একটু পিছিয়ে পড়ল, মন্থর হয়ে এল তাদের গতি। শেষে একটি বাঁক পেরোবার পর তাদের আর দেখা গেল না।

খানিকপর এক শকসৈন্য প্রস্রাবের বেগ সামলাতে না পেরে পথের পাশে এসে দাঁড়ালো। আর তখন সে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে পাহাড়ের অনেক নীচে দুজন স্থানীয় লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে যাচ্ছে পাকদণ্ডী বেয়ে। প্রথমে সে ভাবল কথাটা প্রহরী প্রধানকে জানানো যাক। কিন্তু তারপর তার মনে হল চতুর্দোলাযাত্রা ভীমনগর দুর্গে পৌঁছতে দেরি হলে মহারাজ রুদ্রসিংহ ভারি রুষ্ট হতে পারেন। আর মহাদেবী না হয় মহারাজের শয্যায় উপগত হবেন। বাকি কিঙ্করীরা? প্রহরীরা কি সেই কিঙ্করীদের ভাগ পাবেন না? মহারাজ তো বলেই দিয়েছেন যে বিজিতা নারী মাত্রই অবাধভোগ্যা। ভাবতে ভাবতেই সৈন্যটির পুরুষাঙ্গ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। আর সেই সুস্রোতা প্রস্রাবধারার অনেক নীচে স্থানীয় লোকদুটি মিলিয়ে যায়।

দুটি যুবক গ্রামের পাশের পাহাড়ি পথ বেয়ে নেমে আসছিলেন। তাঁদের পরনে স্থানীয় পোশাক। যদিও সামান্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে তাঁদের পিঙ্গলবর্ণ ত্বক, খর্বাকার নাসা এবং অনুচ্চ দৈর্ঘ্য এই অঞ্চলের স্বাভাবিক দেহাকৃতির সঙ্গে মানানসই নয়।

দুইজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক তরুণী। তরুণীর চলন স্বচ্ছন্দ। যুবক দুইজন প্রতি পদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন করছিলেন। তাতে আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁরা এই অঞ্চলের বাসিন্দা নন, পার্বত্যপথে চলাফেরা তাঁদের অভ্যাসে নেই।

পাহাড়ি পথে উপরে ওঠার থেকে নামার সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যুবক দুইজনের পাদগ্রন্থি এবং পিণ্ডিকা ক্রমেই ব্যথায় আতুর হয়ে উঠছিল। তার মধ্যেই অতি সাবধানে পা ফেলে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটু পর একজন প্রশ্ন করলেন, 'ভদ্রে, আর কতদূর?'

তরুণী মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর দিল, 'আর সামান্যই পথ বাকি আর্য। সাবধানে আসুন। আর পথিপার্শ্বের বৃক্ষশাখাগুলির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

'কেন ভদ্রে?'

'কারণ এই উপত্যকায় ভয়ানক বিষধর সর্পের বাস। তারা প্রায়শই ওই বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। একবার দংশন করলে আর দেখতে হবে না, মুখে জল দেওয়ার সময়টুকুও পাব না।'

যুবক দুইজনের মুখে অতিদ্রুত বিস্ময় ও আতঙ্কের যে অভিব্যক্তি খেলে গেল তরুণী তা লক্ষ্য করল না। যুবক দুইজন বিড় বিড় করে কী যেন বললেন। রুদ্রসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত নাকি নিজেদের ভাগ্য, কাকে অভিসম্পাত দিলেন ঠিক বোঝা গেল না।

একজন সাহস করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার এই পথে যাতায়াত করতে ভয় করে না?'

তরুণী এবার ফিরে তাকাল। তারপর মিষ্ট হেসে বলল, 'না, ওরা আমার পোষা কিনা।'

যুবক দুইজনের মুখে আর কথা জোগাল না।

খানিক পরেই বাঁদিকে একটি সুঁড়িপথ দেখা গেল। তরুণী সেই পথ ধরলেন। পথটি অতীব সংকীর্ণ। ভূমিতল শুষ্কপত্রপুষ্পে আবৃত। পথের দুধারে গুল্মলতাশোভিত বিভিন্ন বৃক্ষশাখা নত হয়ে আছে। যুবক দুজন সভয়ে একবার চাইলেন সেদিকে। তারপর ইষ্টদেব স্মরণ করে পথে পা বাড়ালেন।

ভীমনগর দুর্গ থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে দূরে এই পার্বত্য উপত্যকা। এখান থেকে ভীমনগর দুর্গ পৌঁছবার দুটি পথ। একটি পর্বতশিরা ধরে। সেটিই প্রচলিত পথ। দ্বিতীয় পথটি সমতলভূমি ধরে। দ্বিতীয় পথে অনেক সময় বাঁচে, এক রাত্রের মধ্যেই ভীমনগর দুর্গে পৌঁছানো যায়। তবে সে পথে সমতলে পৌঁছতে গেলে এই উপত্যকা থেকে একটি অতি সংকীর্ণ, প্রায় উল্লম্ব গিরিখাত ধরে নেমে আসতে হয়। তাই সচরাচর সেই পথ কেউ নেয় না।

তরুণীকে অগ্রবর্তী করে সেই যুবক দুজন যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁদের সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। পাদুখানি থরথর কম্পমান। নিজেদের হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজেরাই শুনতে পাচ্ছেন। জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে গ্রীষ্মকালে সারমেয়দের ন্যায়। শুষ্ক ভূমিখণ্ড দেখামাত্র দুজনেই সেখানে লম্বমান হলেন।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকার পর তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমে স্বাভাবিক হল। তারপর উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একটি অতীব মনোরম স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা। পর্বতের একটি অংশ সামান্য বর্ধিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড সৃষ্টি করেছে। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। আর সেই স্রোতিস্বিনীর ঠিক পাশে, ভূমিখণ্ডটির অন্তিমপ্রান্তে একটি প্রস্তরনির্মিত ঘর। তার মাথায় মাথায় শুষ্ক বল্কল ও বৃক্ষশাখার ছাউনি। এই লোকবিবর্জিত উপত্যকায় ছোট্ট কুটিরটি ভারি আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তরুণীটি কুটিরের সামনে গিয়ে দ্বারে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তিনবার আঘাত করলেন।

একজন তরুণ সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পোশাক দেখে মনে হয় তিনি এই অঞ্চলের জনজাতির কেউ একজন। আগন্তুক দুই যুবককে দেখে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, 'কী সংবাদ জয়দ্রথ?'

জয়দ্রথ নামের যুবকটি একটি প্রস্তরখণ্ড তরুণের হাতে তুলে দিল। তরুণ সেই প্রস্তরখণ্ডটি ভালো করে দেখলেন। তাতে কিছু চিহ্ন আঁকা আছে। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'অতি উত্তম, অতি উত্তম। তোমাদের কেউ পথে দেখে ফেলেনি তো?'

'না প্রভু।'

'জয়দ্রথ, সময় উপস্থিত হয়েছে, প্রস্তুত হও। আজ মধ্যরাত্রের মধ্যেই ভীমনগর দুর্গে পৌঁছাতে হবে। সঙ্গীরা সবাই প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ প্রভু। কিন্তু আজ মধ্যরাত্রের মধ্যে...'

'হ্যাঁ জয়দ্রথ, আদেশ সেইরকমই।'

'কিন্তু প্রভু, এই উপত্যকা থেকে গিরিশিরা ধরে উপরে উঠে ভীমনগরের পথ ধরতেই তো অর্ধদিবস গত হবে। মধ্যরাত্রের মধ্যে ভীমনগর দুর্গে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।'

তরুণের মুখে ভ্রুকুটি দেখা দিল। তিনি কুটিরের বাইরে এসে কিছুক্ষণ পদচারণা করলেন। তারপর আগত তরুণীকে অতি শিষ্টাচারের সঙ্গে সম্বোধন করে বললেন, 'অয়ি ভদ্রে...'

তরুণীটি নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'আদেশ করুন কুমার।'

কুমার বললেন, 'আজ রাত্রের মধ্যে ভীমনগর দুর্গ পৌঁছবার কোনও উপায়...'

তরুণীটি উঠে এলেন। কুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আছে কুমার। কিন্তু সে পথ বড়ই কঠিন। আপনি কি পারবেন?'

এই তরুণীকে দেখামাত্র কুমারের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়, সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিন থেকেই। তবু তিনি এতদিন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে এসেছেন। কিন্তু আজকের এই প্রশ্ন তাঁর স্পর্ধাকে জাগিয়ে তুলল। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আমাকে চিনলে ওই প্রশ্ন করতেন না ভদ্রে।'

তরুণী খিলখিল করে হেসে উঠল। কুমারের হৃদয় আরেকবার অতিস্পন্দিত হল।

তরুণী বলল, 'বেশ। তবে আপনার সঙ্গীসাথীদের আহ্বান করুন। আমরা দণ্ডকালের মধ্যেই যাত্রা শুরু করতে পারি।'

'না, এক দণ্ড নয়, আরও কিছু সময় লাগবে। জয়দ্রথ আমাদের মধ্যে গৌড়, বঙ্গ বা সমতটের কেউ আছে?'

জয়দ্রথ বলল, 'আছে প্রভু। সাকেত, বিজয় আর মুকুন্দ। কিন্তু কেন প্রভু?'

তরুণ আদেশ দিলেন, 'ওদের এখুনি আমার কাছে আসতে বলো, আর সঙ্গে যেন তিনটি মোটা কাপড়ের তৈরি বড় পুটিকা থাকে।'

জয়দ্রথ বিস্মিত হল। প্রশ্ন করল, 'কেন প্রভু? কাপড়ের পুটিকা কেন? আর এমন কী কাজ আছে যা ওদের দ্বারাই হবে, আমাদের দ্বারা সম্ভব না?'

তরুণ মৃদু হেসে বললেন, 'সব কাজ সবার জন্য নয় জয়দ্রথ। গৌড়বঙ্গের অধিবাসীরা যেমন ধূর্ত তেমন সাহসী। ওদের দেশ নদীমাতৃক দেশ, সে বড় সর্পসঙ্কুল স্থান। সেইসব অতি ভয়ানক সর্পকুলের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে ওরা। আজ ওদের সেই দক্ষতা আমার ভীষণ প্রয়োজন।'

এই বলে তিনি সেই শ্যামাঙ্গী তরুণীর দিকে ফিরলেন, 'ভদ্রে। আপনার আরও কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। আশা করি আমাদের নিরাশ করবেন না।'

সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। চতুর্দোলাযাত্রা প্রায় ভীমনগর দুর্গের কাছাকাছি। একটু পরেই রাত্রি নেমে আসবে। রাত্রিকালে পাহাড়ি পথে চলাফেরা করা খুব বিপজ্জনক। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু রুদ্রসিংহের কঠিন আদেশ, রাতের মধ্যেই যেন মহাদেবী ভীমনগর দুর্গে প্রবেশ করেন। একটু আগেই দুর্গ থেকে দ্রুতগামী অশ্বে চেপে বিশেষ দূত এসেছিল। শকপ্রহরী প্রধানের কাছে রুদ্রসিংহের আদেশ শুনিয়ে গেছে।

শকপ্রহরীদের প্রধান গম্ভীরমুখে আদেশ শুনেছেন। পালন করার অঙ্গীকারও করেছেন। তিনি জানেন এই আদেশের অর্থ কী। মহারাজ আশঙ্কা করছেন যে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহী হয়ে পথিমধ্যে এই চতুর্দোলাযাত্রা আক্রমণ না করে বসেন। নিজের প্রেয়সীকে অন্যের রক্ষিতারূপে প্রেরণ করা হচ্ছে, কোনও পুরুষসিংহ তা সহ্য করতে পারে?

শকসৈন্যরা বড় বড় দণ্ডবর্তিকা জ্বেলে সেই আলোর পথ ধরে পাহাড়শ্রেণী বেয়ে নেমে আসছে ভীমনগর দুর্গের দিকে। অন্ধকার আকাশের প্রেক্ষাপটে তাদের ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন চলমান স্নিগ্ধ আলোর স্রোত নেমে আসছে পাহাড়ের বুক চিরে।

অনেক নীচ থেকে সেই আলোর মিছিল দেখছিল আরও একদল লোক। তাদের গায়ে স্থানীয় গ্রাম্য পোশাক, দেহ ধূলিধূসরিত। সেই আলোর শোভাযাত্রা দেখে দলপ্রধান একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'তাড়াতাড়ি চল রে সবাই। যে করেই হোক মধ্যরাত্রের মধ্যেই ভীমনগর দুর্গে পৌঁছাতে হবে।'

দলের একদম শেষে তিনজন খর্বদেহ, কৃষ্ণকায় মানুষ পথ হাঁটছিল, তাদের পিঠে তিনটি বড় বড় পুটিকা। তাদের মধ্যে একজন চাপাস্বরে জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁ রে মুকুন্দ, কোন অষ্টকুষ্ঠীর পুত্র কুমারকে জানিয়েছে যে আমরা গৌড়বঙ্গ আর সমতটের লোক?'

মুকুন্দ উত্তর করল, 'আর কে? ওই জয়দ্রথ।'

প্রথমজন দাঁতে দাঁত চিপে বলল, 'শ্যালিকাপুত্রটিকে একবার হাতের কাছে পাই, যদি ওর অণ্ডদুটিকে খণ্ড খণ্ড করে শিবাভোগ না দিয়েছি তো আমার নাম বিজয় নয়।'

তৃতীয়জন সাকেত। সে বলল, 'সত্যি বাপু আর পারি না। দেশে থাকতে একটি দুটি সাপ ধরেছি বটে। সেও নেহাত বাধ্য হয়ে। কিন্তু এই কাজ? এ আর আমার দ্বারা হবে না বাপু।'

বিজয় বলল, 'যা বলেছিস ভাই। ভালোয় ভালো পাটলিপুত্রে ফিরে যাই একবার। তারপর সেখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে দেশে ফিরে কৃষিকাজে মন দেব।'

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, 'আর তোর সেই প্রেয়সী, রাজলক্ষ্মী না কী যেন নাম তার? তার কী হবে?'

বিজয় উদাসস্বরে বলল, 'সে কি আর আমার অপেক্ষায় বসে আছে রে মুকুন্দ? পাটলিপুত্র হল গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী। কত বড় বড় নাগরের বাস। দেখ, সে হয়তো ইতিমধ্যেই কারোর অঙ্কশায়িনী হয়েছে। চল চল, এখন পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল তো দেখি!'

তিনজন খানিক চুপচাপ চলল। তারপর মুকুন্দ বলল, 'তবে একটা কথা বলতেই হবে ভাই। আমাদের কুমার কিন্তু যেমন বীর, তেমন সাহসী! কতজন আর বহুদিদির জন্য এতটা করে বল?'

সাকেত বলল, 'হ্যাঁ, সে আর বলতে? দুই কুমারই মহাদেবীকে বড়ই শ্রদ্ধা করেন।'

মুকুন্দ বলল, 'বড় কুমারও?'

সাকেত মুচকি হেসে বলল, 'হুঁ।'

বিজয় বলল, 'ও, ওটাকে তোরা শ্রদ্ধা বলিস বুঝি?'

শুনে তিনজন ফিকফিক করে হাসতে লাগল। তারপর মুকুন্দ কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাদ দে ভাই, রাজরাজড়াদের ব্যাপার, আমাদের শুনে কাজ কী? চল চল, পা চালিয়ে চল দেখি। দেরি হলে কুমার ক্রুদ্ধ হবেন।'

ঠিক মধ্যরাত্রের আগে চতুর্দোলাযাত্রা এসে পৌঁছাল ভীমনগর দুর্গের সামনে। শকপ্রহরী প্রধান উচ্চৈস্বরে বললেন, 'দ্বাররক্ষক, দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করো।'

প্রত্যুত্তরে দ্বাররক্ষী বলল, 'সঙ্কেতবাক্য বলুন।'

সঙ্কেতবাক্য উচ্চারিত হলে ধীরে ধীরে খুলে গেল ভীমনগর দুর্গের অতি বৃহৎ দ্বার। চতুর্দোলাযাত্রা তার মধ্য দিয়ে নগরের মধ্যে অন্তর্হিত হল। দ্বারবন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হল। মস্ত বড় সে দরজা; খুলতে যেমন সময় নেয়, বন্ধ হতেও তেমনই।

দ্বার প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ ছুটতে ছুটতে একদল গ্রাম্য লোক সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের বসন মলিন, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। দলপ্রধান উচ্চৈস্বরে বলল, 'আরে দ্বাররক্ষী থামো থামো, দরজা বন্ধ করো না। আমাদের ভেতরে যেতে দাও।'

দ্বাররক্ষী গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা?'

দলপ্রধান বলল, 'আমরা গুপ্ত শিবির থেকে এসেছি। দ্বার উন্মুক্ত করো।'

দ্বাররক্ষীর ভ্রু কুঞ্চিত হল। বলল, 'কিন্তু তারা তো একটু আগেই ভেতরে চলে গেছে।'

'তো আমরাও যাব।'

'বেশ, তাহলে সঙ্কেতবাক্য বলো।'

দলপ্রধান কুপিতস্বরে বলল, 'সঙ্কেতবাক্য? সে তো একটু আগেই প্রহরী প্রধান বলেই গেছেন।'

দ্বাররক্ষী বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কী করে নিশ্চিত হই যে তোমরা সেই দলের লোক কিনা?'

এবার দলপ্রধানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'ওহে অকালকুষ্মাণ্ড, আমরা গুপ্তশিবির থেকে এসেছি, মহাদেবী ধ্রুবার প্রসাধনী আর গহনা নিয়ে। যদি তোমার জন্য মহাদেবী ধ্রুবার প্রসাধনে দেরি

হয় আর সেই জন্য তাঁর মহারাজা রুদ্রসিংহের শয্যায় যেতে বিলম্ব হয়, তাহলে তোমার কপালে কী দুঃখ আছে তা জানো তো?'

দ্বাররক্ষী ইতস্তত করতে লাগল। রুদ্রসিংহের ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর। ক'দিন আগেই রান্নায় লবণ কম হয়েছিল বলে প্রধান পাচককে উলঙ্গ করে ক্ষুধার্ত পাহাড়ি সারমেয়দের সামনে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেই হতভাগ্যের স্ত্রী পুত্রকে বাধ্য করেছিলেন সেই দৃশ্য দেখতে।

দ্বাররক্ষীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে একটু এগিয়ে এল দলপ্রধান। একটি পেটিকা খুলে বলল, 'এই দেখো, এবার বিশ্বাস হল তো?'

পেটিকার দিকে তাকিয়ে দ্বাররক্ষীর চোখ ঝলসে গেল। শত শত বহুমূল্য রত্নরাজি এবং গহনা তারমধ্যে থরে থরে সাজানো। তার মধ্যে অর্ধচূড় কেয়ূর, নক্ষত্রমালা, চূড়ামণ্ডল, প্রালম্বিকা কণ্ঠহার, সবই আছে। আর আছে বিচিত্র সব রত্নশোভিত নন্দাবর্ত্য, শুক্তিমুদ্রিকা এবং স্বর্ণমধ্য কর্ণবেষ্টন।

দ্বাররক্ষী বড়ই দরিদ্র মানুষ, বেতন অতি সামান্য। একমাত্র শকসৈন্যরা যখন পররাজ্য লুণ্ঠন করে ফিরে আসে, তার থেকে সামান্য ভাগ সে পায়। সেই তার ভবিষ্যতের একমাত্র পাথেয়।

দ্বাররক্ষী এদিক-ওদিক দেখে টুক করে একটি সোনার বজ্রবেষ্টক তুলে নিয়ে শিরস্ত্রাণের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, যাও যাও।'

গ্রাম্য দলটি ধীরে ধীরে দরজার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুদ্রসিংহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর শয্যাভবনে। পরনে পার্বত্য মেষরোম হতে প্রস্তুত বহুমূল্য পোশাক। কণ্ঠে ঝুলছে স্বর্ণনির্মিত রত্নশোভিত নক্ষত্রমালা। আঙুলের দ্বিহীরক বজ্রাঙ্গুরীয়টিকে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি ভাবছিলেন আজ যদি ধ্রুবা নিজেকে তাঁর কাছে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ করে তাহলে তিনি তাকে কী উপহার দেবেন। বজ্রাঙ্গুরীয়টিই যথেষ্ট? নাকি নক্ষত্রমালাখানি দান করাই সুসঙ্গত দেখায়?

ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে আরও খানিক আরক পান করলেন। আহা, পারস্যদেশীয়রা কী পানীয়ই না আবিষ্কার করেছে। এক চুমুকেই হৃদয়ে প্রফুল্লভাব জাগ্রত হয়।

কিন্তু ধ্রুবার এসে পৌঁছতে এত দেরি হচ্ছে কেন? এতক্ষণে তো তার পৌঁছে যাওয়ার কথা। তারপর সামান্য প্রসাধন করেই তার আসার কথা। কোথাও কোনও গোলযোগ হল না তো?

ভাবতে ভাবতেই দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। রুদ্রসিংহ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'কে? ভেতরে এসো।'

মহাপ্রতিহার দত্তসেন এবং রুদ্রসিংহের প্রিয়তমা রক্ষিতা চম্পাবতী প্রবেশ করলেন। চম্পাবতী বললেন, 'ওঁরা এসে গেছেন মহারাজ।'

প্রসন্ন হলেন রুদ্রসিংহ। তৃপ্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'ধ্রুবা এসেছে? সে প্রস্তুত তো? তাহলে তাকে এক্ষুনি নিয়ে আসা হোক এই শয্যাভবনে। আর অপেক্ষার প্রয়োজন কী?'

চম্পাবতী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, তিনি শুধু প্রস্তুতই নন, তিনি এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।'

রুদ্রসিংহ হস্তধৃত আরকের পাত্রটি এক নিঃশ্বাষে শেষ করে বললেন, 'তাই নাকি? বেশ বেশ। আমার পৌরুষের খ্যাতি ধ্রুবার কানেও পৌঁছেছে তাহলে? তবে তাই হোক। আজ রুদ্রসিংহের শয্যায় পিষ্ট হোক গুপ্তবংশের রাজলক্ষ্মী। আর দেরি কীসের?

মহাপ্রতিহার দত্তসেন কিঞ্চিৎ ইতস্তত করলেন। তারপর করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, মহাদেবী ধ্রুবার একটি অনুরোধ আছে।'

মদ্যপাত্র হাতে ধমকে উঠলেন রুদ্রসিংহ, ‘মহাদেবী আবার কী? এখন থেকে ও আমার যৌনদাসী, আমার রক্ষিতা। এই যেমন চম্পাবতী, তেমনই। এবার ওকে তোমরা সবাই নাম ধরেই ডাকবে এখন থেকে। বুঝেছ?’

চম্পাবতীর মুখ সামান্য ম্লান হয়েই পুনরায় স্বাভাবিক হল। দ্রুত ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন দত্তসেন। মদ্যপ রুদ্রসেনের আদেশ যার হৃদয়ঙ্গম হয় না সে শুধু মূর্খ নয়, মহামূর্খ। তারপর বললেন, ‘ধ্রুবা একটি অনুরোধ করেছেন প্রভু। তাঁর সঙ্গে তার আবাল্যসখী মন্দাকিনীও এসেছেন ভীমনগর দুর্গে। তাঁরা দুজনেই আপনার শয্যাভবনে একত্রে প্রবেশ করতে চান।’

প্রথমে চমকিত, তারপর বিস্মিত এবং পরিশেষে বড়ই পুলকিত হলেন রুদ্রসিংহ। হা হা করে হেসে উঠে বললেন, ‘বাহ্ বাহ্, ধ্রুবা বড়ই কামচতুরা দেখছি। প্রথম রাতেই ত্রিসঙ্গম চায়? এ তো বড়ই আমোদের বিষয়। ঠিক আছে, দুজনকেই সুসজ্জিত করে আমার শয্যাকক্ষে নিয়ে এসো তাহলে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার সময় দুকলস মাধ্বী পাঠিয়ে দিও তো। আর দেখো, আমার শয্যাভবনের সামনে যেন কোনও পুরুষ প্রহরী না থাকে। আমি চাই না তাদের শীৎকারের শব্দ কোনও পুরুষের কর্ণগোচর হোক।’

দত্তসেনের মুখ দেখে মনে হল শেষ আদেশটা বোধহয় তাঁর মনঃপুত হয়নি। কিন্তু রুদ্রসিংহের কথার উপর কথা বলে এমন বুকের পাটা কার আছে ভীমনগর দুর্গে?

তিনি এবং চম্পাবতী, দুজনেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

রাত্রিভর পর্বতশিরায় অবস্থান করে শত্রুর দিকে ধনুর্বাণ লক্ষ্য করে থাকা বড় সহজ কাজ নয়। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিলেন নন্দকুমার। কিন্তু প্রভুর কর্মে বিরক্তি আসা রাষ্ট্রদ্রোহের সমান। তার ওপর প্রভুর নাম যদি রুদ্রসিংহ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তাই নিজের অবাধ্য মনকে বুঝিয়ে কর্তব্যকর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

নন্দকুমার যুবক, উদ্যমী, এবং রুদ্রসিংহের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে অন্যতম। তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে যে নন্দকুমার মহারাজ রুদ্রসিংহকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন। মহারাজ রুদ্রসিংহও অবশ্য নন্দকুমারকে কম স্নেহ করেন না। যেখানেই অতিদ্রুত কর্মসাধনের প্রয়োজন পড়ে সেখানেই নন্দকুমারের ডাক পড়ে। এই করে করেই নন্দকুমারের আর বিবাহ করা হয়ে উঠল না।

তবে তাতে যে নন্দকুমার খুব দুঃখে আছেন তা নয়। রুদ্রসিংহের সমরাভিযান মানেই বিভিন্ন বয়স, আকার ও আকৃতির নারীসম্ভোগের অবাধ আনন্দযজ্ঞ। তাছাড়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ তো আছেই। মহারাজের কৃপাদৃষ্টি তো তার উপর অতিরিক্ত। সব মিলিয়ে নন্দকুমার মহানন্দে আছেন।

কাল যখন মহারাজ ডেকে এই অতি গোপনীয় কাজের ভার দিয়েছিলেন নন্দকুমারকে, তখন ভারি গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি সব বুঝিয়ে দেওয়ার পর বলেছিলেন, ‘একটি পুরুষও যেন না বাঁচে নন্দ, আর একটিও যৌবনবতী নারী যেন আঘাতপ্রাপ্তা না হয়।

‘যদি তারা আমার প্রস্তাব অমান্য করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের আক্রমণ করবে। আর ওই নপুংসক রামগুপ্ত যদি আমার কথামতো ধ্রুবাকে আমার কাছে প্রেরণ করতে সম্মত হয়, তাহলে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ধ্রুবা রামনগর দুর্গে পৌঁছয়। ধ্রুবা রামনগর পৌঁছানোমাত্র তোমার কাছে দূত প্রেরণ করা হবে। তার কাছ থেকে সংবাদ পেলেই গুপ্তবংশ সমূলে ধ্বংস করবে। ওদের সংগ্রহে থাকা রত্নরাজি, বন্দিনী নারী, আর রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তর কর্তিত মুণ্ড, এ ছাড়া আর কিছুই আনার প্রয়োজন নেই। সবকিছু অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করবে। বুঝেছ?’

সরল আদেশ, না বোঝার কিছুই নেই। সেই থেকে এই পার্বত্য উপত্যকা সঙ্গীসাথীসহ অবরোধ করে বসে আছেন নন্দকুমার। ধ্রুবা রওনা দিয়েছেন প্রায় এক দিবস হতে চলল। আশা করা যায় মহারাজের দূত এসে পৌঁছল বলে।

শত্রুপক্ষের ভাবগতিক দেখে অবশ্য ভারি হতোদ্যম হয়ে পড়ছিলেন নন্দকুমার। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এরা নাকি অর্ধজম্বুদ্বীপের অধিপতি সমুদ্রগুপ্তর বংশধর? প্রতিরোধের কোনও উদ্যোগই নেই? এইভাবে কেউ নিজের পট্টমহিষীকে অন্যের রক্ষিতা হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়?

আর কোথায় সেই চন্দ্রগুপ্ত? সে নাকি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বীর? মালব আক্রমণের সময় সে নাকি একাই পরাস্ত করেছিল শকসৈন্যদল? নেহাত সেই যুদ্ধে নন্দকুমার ছিলেন না, থাকলে বোঝা যেত কে কত বড় বীর, হুঃ!

ভাবতে ভাবতেই মুখব্যাদান করে জৃম্ভণ করলেন নন্দকুমার। কখন আসবে দূত?

খানিক পর নন্দকুমার ভাবলেন উঠে একটু পায়চারি করে নেওয়া যাক। একটু পরেই তো পরিশ্রমের কাজ। হাত পায়ের জড়তা ত্যাগ করা প্রয়োজন।

এই পর্বতশ্রেণীটি হিমালয়ের অন্যান্য গিরিশিখরের তুলনায় অতীব অনুচ্চ। অরণ্যাচ্ছাদিত পর্বতটিতে আরোহণ এবং সেখান হতে অবতারণ অতি সহজ। এতদঞ্চলের আধিবাসীরা প্রায়শই এখানে ফলমূলাদি এবং শুষ্ক বৃক্ষশাখার সন্ধানে আসে। তাই চলাচলের জন্য কয়েকটি পথ রয়েছে।

নন্দকুমার সেইরকমই একটি পথ ধরে পদচারণা করতে লাগলেন। বাকি সৈন্যরা একাগ্রচিত্তে ভল্ল এবং ধনুতে শরসন্ধান করে বসে আছে। এখান হতে গুপ্ত শিবিরের প্রতিটি অংশই সহজলক্ষ্য। নন্দকুমারের আদেশ পাওয়ামাত্র প্রতিটি শরে অগ্নিসংযোগ করা হবে। তারপর জ্বলন্ত শিবির হতে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকা শত্রুদের শিকার করা তো এদের কাছে বাল্যক্রীড়া।

হাঁটতে হাঁটতে অরণ্যের সামান্য গভীরে চলে গেছিলেন নন্দকুমার। আর তখনই শব্দটি কানে এল তাঁর। নূপুরনিক্কন না?

খানিক উৎকর্ণ হয়ে শব্দটি শুনলেন তিনি, হ্যাঁ, নুপুরনিক্কনই। তার মানে নারী!

ভারি উৎসাহিত হয়ে সেই শব্দের উৎসের দিকে সন্তর্পণে হাঁটতে শুরু করলেন নন্দকুমার।

একটু পরেই যখন সেই গ্রাম্যদলটি হাঁপাতে হাঁপাতে রুদ্রসিংহের শয্যাভবনের সামনে উপস্থিত হল, তার কিছু আগেই মহাদেবী ধ্রুবা এবং মন্দা সেখানে প্রবেশ করেছেন। শয্যাভবনের দ্বারে কিঙ্করীরা আর দত্তসেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। দত্তসেন মহারাজ রুদ্রসিংহের আদেশটুকু পালন করেছেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। অন্যান্য পুরুষ প্রহরীরা আশেপাশেই একটু আড়ালে লুকিয়ে আছে।

এই গ্রাম্যদলটি শয্যাভবনের সামনে এসে দাঁড়াতে দত্তসেনের ভ্রূ দুখানি কুঞ্চিত হল। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কে তোমরা? এখানে কী করছ?'

দলপ্রধান বিগলিত হেসে বলল, 'প্রণাম হই প্রহরী মশাই, আমরা গুপ্তশিবির হতে মহারানির প্রসাধনী ও গহনা নিয়ে এসেছি।'

মহাপ্রতিহার দত্তসেনের ধাতু হল ক্ষিপ্তধাতু, তিনি অতি অল্পতেই বড় ক্রুদ্ধ হন। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আমি প্রহরী নই।'

দলপ্রধান ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে কি আপনি কিঙ্কর?'

উত্তেজিত হলেই দত্তসেনের কথা আটকে যায়। তিনি গর্জে উঠলেন, 'আআআআআমি কি...কি...কিঙ্কর নই। আমি হলাম মহা...মহা...মহা...'

দলপ্রধান মহাবিস্ময়ে বলল, ‘আপনি মহাকিঙ্কর? কী সর্বনাশ!’

দত্তসেন ঘোর উত্তেজিত হয়ে ক্রুদ্ধস্বরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পাশ থেকে কিঙ্করীপ্রধানা চম্পাবতী ধমকে উঠলেন, ‘কাকে কী বলছ বাছা! জানো উনি কে? উনি মহাপ্রতিহার দত্তসেন।’

কথাটা শুনেই গ্রাম্যদল প্রধানের চোখমুখের ভাষা পালটে গেল। সে সাগ্রহে বলে উঠল, ‘আপনিই সেই মহাবল দত্তসেন যাঁর বীরত্বের কাহিনি চারণের দল সমগ্র জম্বুদ্বীপে পথেঘাটে গেয়ে বেড়ায়? আপনিই সেই অতিরথ মহাবীর যিনি একত্রে গাণ্ডীবধন্বা ফাল্গুনী আর গদাধারী ভীমের সমকক্ষ? আপনিই সেই দত্তসেন, কূটবুদ্ধিতে যাঁর প্রতিস্পর্ধা একমাত্র বাসুদেব কৃষ্ণর সঙ্গে? যিনি জ্ঞানে ব্যাসদেব, চরিত্রে হরিশ্চন্দ্র এবং যুদ্ধে স্বয়ং বৃত্রধারী ইন্দ্র, আপনিই তিনি? ওরে তোরা কে আছিস...প্রণাম কর, প্রণাম কর। আজ তোদের জীবনযৌবন সফল হল, দশদিশি নির্দ্বন্দ্ব হল...’

গ্রাম্যদলের প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ দত্তসেনের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হল।

ক্ষিপ্তধাতুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ ধাতু সহজেই রুষ্ট এবং সহজেই তুষ্ট হয়। দত্তসেন খর্বকায়, দত্তসেন স্থূল, দত্তসেনের মস্তকে মস্ত বড় ইন্দ্রলুপ্ত এবং দত্তসেনের গাত্রবর্ণ ঘোরকৃষ্ণ। তদুপরি দত্তসেন জীবনে কোনওদিন যুদ্ধ তো করেনইনি, এমনকী তিনি ভীমনগরের বাইরে কোনওদিন পা-ই রাখেননি।

কিন্তু এমন প্রশস্তিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও অভিভূত হন, দত্তসেন তো মানুষ। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, ‘আহা, থাক থাক। কল্যাণ হোক, সুমতি হোক, সৌভাগ্য হোক। তা বাছারা এখানে কী মনে করে?’

দলপ্রধান প্রণাম করে উঠে দুহাতে ভক্তিভরে চোখের জল মুছল। তারপর কটিবন্ধের আড়াল হতে ধীরেসুস্থে একটি দীর্ঘকায় তরবারি বের করে দত্তসেনের গলায় ধরে বলল, ‘তারপর মহাপ্রতিহার মশাই, দয়া করে শয্যাভবনের দ্বারটি উন্মুক্ত করুন তো দেখি। ওই জারজ কামুকটার ধর্ষনেচ্ছা জন্মের মতো মিটিয়ে দিয়ে যাই!’

মহা আতঙ্কিত দত্তসেন প্রশ্ন করলেন, ‘ক্কে তুমি? ক্কে তুমি? ক্কে তুমি?’

তরুণটি একগাল হেসে ভারি বিনীতভাবে বলল, ‘অধমের নাম কচ, কুমার কচগুপ্ত।’

একটি বাঁক পেরিয়েই তাকে দেখতে পেলেন নন্দকুমার। একটি অতিবৃহৎ দেবদারু বৃক্ষের নীচে বসে আছে সে। দুই পা সামনের দিকে প্রসারিত। কেশরাজি অবিন্যস্ত ও বিস্রস্ত। মুখখানি অন্যদিকে ফিরানো। প্রথম দর্শনে মনে হয়ে দেহে যেন প্রাণ নেই।

ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন নন্দকুমার। তরবারি কোষমুক্ত করে তার অগ্রভাগ দিয়ে মেয়েটির মুখ নিজের দিকে ফেরালেন।

আহা, কী অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। জীবনে কম নারী ভোগ করেননি নন্দকুমার। কিন্তু এমন কমনীয় সৌন্দর্য কমই দেখেছেন তিনি। এই জোছনার আলোছায়ায় মনে হচ্ছে যেন কোনও শাপভ্রষ্ট অপ্সরা নেমে এসেছেন মর্ত্যলোকে।

নন্দকুমার গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি কে কন্যা? এই পর্বতারণ্যে একাকী কী করছ?’

মেয়েটি খানিকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল নন্দকুমারের দিকে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ‘আমি মগধের এক বড় অভাগিনী নারী, আর্য। আমাকে উদ্ধার করুন।’

নন্দকুমার চমকিত হলেন। প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি এখানে এলে কী করে?’

মেয়েটি যা জানালো তা এইরকম।

এই অভাগিনী হল পট্টমহিষী ধ্রুবার একান্ত সহচরী। রুদ্রসিংহের বাহিনী গুপ্তশিবির ঘিরে ধরামাত্র সেখানে প্রবল গোলযোগ এবং অন্তর্বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। ধ্রুবাকে রুদ্রসিংহের হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতেই ক্ষুব্ধ

চন্দ্রগুপ্ত তরবারি হাতে সম্রাট রামগুপ্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলত দুজনেই এখন মারাত্মকভাবে আহত। অবস্থা বুঝে সেনাপতি সূর্যস্বামী এবং মহামাত্য শিখরস্বামী পলাতক। সম্রাটের সঙ্গে আসা সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহী হয়েছে। প্রাক্তন সেনাপ্রধান দনুজদমন দায়িত্ব নিতে গিয়ে বিদ্রোহী সেনাদের হাতে নিহত। অন্যান্য অমাত্যরা হয় বন্দী, নয়তো আহত হয়েছেন।

গুপ্তসেনাদের অনেকেই রুদ্রসিংহের বাহিনীতে যোগ দিতে চায়। এমন অবস্থায় এই কন্যা এবং তার সহচরীরা গুপ্তশিবিরে আর নিজেদের নিরাপদ বোধ করছে না। তাই তারা অতি সঙ্গোপনে পালিয়ে এসেছে এই অরণ্যে। আর্য কি তাদের কোনওভাবে নিরাপদে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করতে সাহায্য করতে পারেন? অবশ্য তার জন্য আর্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। ধ্রুবা এবং রাজমাতা দত্তাদেবীর অধিকাংশ গহনা তারই কাছে গচ্ছিত থাকত। সেসব বহুমূল্য রত্নরাজি সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। তার অর্ধাংশ সে সাহায্যের মূল্যস্বরূপ আর্যর করকমলে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। আর্য কি সেসব রত্নরাজি নিজের চোখে একবার দেখতে চান?

নন্দকুমারের মনে হল এমন সুমধুর সংবাদ বহুদিন তাঁর কর্ণগোচর হয়নি। তিনি আকর্ণবিস্তৃত হেসে বললেন, 'সে তো বটেই সে তো বটেই। তা কোথায় আছে সেই রত্নসম্ভার? আর তোমার বাকি সঙ্গিনীরাই বা কোথায়? তাদের সঙ্গেও একবার দেখা করতে হয় তো।'

মেয়েটি উঠে বসে বলল, 'আসুন আর্য।'

মহাদেবী ধ্রুবা সলজ্জপদে শয্যাভবনে প্রবেশ করেই স্বহস্তে দ্বারটি বন্ধ করলেন। তবে তিনি একা নন, সঙ্গে আরেক অবগুণ্ঠিতা নারী। ধ্রুবা রুদ্রসিংহের দিকে আনতশ্রদ্ধ অভিবাদন করে বললেন, 'মহাবীর রুদ্রসিংহকে দাসী ধ্রুবার প্রণাম।'

রুদ্রসিংহ প্রসন্নস্বরে বললেন, 'এসো ধ্রুবা এসো। এই যে তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ, এতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তোমার মতো বীরাঙ্গনাকে অঙ্কশায়িনী করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। সেই মালবদেশের অবরোধের সময় তোমার যুদ্ধকৌশল আমাকে বড় মুগ্ধ করেছিল। তখন থেকেই বড় সাধ ছিল তোমাতে উপগত হওয়ার। সে যাই হোক, তোমার সঙ্গে ওটি কে?'

ধ্রুবা ব্রীড়ানত স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে, এ আমার বাল্যসখী মন্দা, নাথ। আপনার বীরত্বের বহু কাহিনি শৈশব থেকেই আমাদের মন জয় করেছে। তাই মন্দাও এসেছে আমার সঙ্গে, সেও আমার সাথে আপনার চরণের দাসী হতে চায়।'

রুদ্রসিংহ হা-হা করে হেসে বললেন, 'বাহ্‌ বাহ্‌, অতি চমৎকার! তোমাদের দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আশা করি তোমাদের দুজনকেই শয্যায় তৃপ্ত করতে পারব। এসো, এবার অবগুণ্ঠনখানি খোলো দেখি!'

ধ্রুবা অবগুণ্ঠন খুলে মহারাজের দিকে তাকিয়ে একটি সলজ্জ হাসি উপহার দিলেন। কিন্তু মন্দা অবগুণ্ঠন খুললেন না। তার বদলে মহারাজের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হলেন।

ধ্রুবা অবাক হলেন তারপর ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'একী মন্দা, এ কেমন আচরণ? মহারাজের শ্রীচরণবন্দনায় প্রথম অধিকার আমার। তুমি কোন বিবেচনায় সেই অধিকার খর্ব করলে? তুমি না আমার সখী! তুমি কি আমার প্রতিস্পর্ধি হতে চাইছ? আমার পূর্বে মহারাজের অঙ্কশায়িনী হতে চাইছ? মনে রেখো, আমি কখনোই তা হতে দেব না।'

রুদ্রসিংহ বললেন, 'আহা থাক না, আজ আবার কলহ কেন?'

ধ্রুবা উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'কলহের কারণ আছে মহারাজ। এই নারী আমার বাল্যসখী। আমার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে, মালব রাজকোষের অন্নে পরিপুষ্ট হয়েছে। এর সমস্ত পালনপোষণ করেছেন আমার

পিতা চন্দ্রজ্যোতি। আর আজকে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আমার আগে আপনার অঙ্কশায়িনী হতে চায়? এ কখনোই হতে পারে না।'

বলতে বলতেই ধ্রুবা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অবগুণ্ঠিতার উপর। তারপর দুইজনে পথকুক্কুরীর মতো একে অন্যকে আক্রমণ করতে লাগলেন।

রুদ্রসিংহ এই দুই কলহরতা নারীদের দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'আহা...বড় আনন্দের দিন। আজ যদি ওই হতভাগ্য রামগুপ্ত আর চন্দ্রজ্যোতি এখানে থাকত, তবে তারা দেখত তাদের স্ত্রী এবং কন্যা আমার অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য কীরকম ব্যাকুল ও উদগ্রীব হয়ে আছে। এসো, তোমরা এই অনর্থক কলহ বন্ধ করে একে একে আমার শয্যায় এসো দেখি। আমি একরাত্রে দুজনকেই তৃপ্ত করতে সমর্থ।'

বলতে বলতেই রুদ্রসিংহ দুজনের হাত ধরে পৃথক করতে গেলেন। আর ঠিক তখনই ধ্রুবা একটানে ছিঁড়ে ফেললেন অবগুণ্ঠিতা নারীটির বস্ত্রাবরণ, খসে পড়ল তাঁর কায়াবন্ধ ও অন্তরীয়। রুদ্রসিংহ সচকিত হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে মন্দা নয়, দাঁড়িয়ে আছেন গুপ্তবংশের গৌরব, মহাপরাক্রমশালী কুমার চন্দ্রগুপ্ত!

খানিক পথ যাওয়ার পর নন্দকুমার বুঝতে পারলেন যে তিনি ক্রমেই আরও ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। পথটি প্রথমে নীচের দিকে কিছুটা গিয়ে পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। কন্যাটিও মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে নিবিড় বনানীর মধ্যে। কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেলেই একবার হাঁক দেন তিনি। মেয়েটি সাড়া দিয়ে তাকে পথ চিনিয়ে দেয়।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে ফেলল সপ্তমীর চাঁদ। অরণ্যে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

নন্দকুমারের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। চারিদিকের এই নিশ্চুপ অন্ধকার, বাতাসে পাতার মর্মরধ্বনি, সবই বড় অদ্ভুত মনে হতে লাগল তাঁর। তিনি একবার মৃদুস্বরে মেয়েটিকে ডাকলেন।

এই প্রথমবার কোনও উত্তর এল না।

নন্দকুমার বীর এবং সাহসী পুরুষ। তবু তাঁর ভয় করতে লাগল। তিনি এবার একটু উচ্চস্বরে ডাকলেন মেয়েটিকে। তখনই তাঁর খেয়াল হল যে তিনি মেয়েটির নাম জানেন না।

নন্দকুমার ভাবছিলেন তিনি ফিরে যাবেন কি না। আর ঠিক তখনই একটি ক্ষীণ শিসের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। তারপর আরও শিসের শব্দ।

নন্দকুমারের মাথার মধ্যে বিপদের ঘণ্টি বেজে উঠল। লোভের বশবর্তী হয়ে মস্ত বড় ছলনার শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁকে দ্রুত নিজের সঙ্গীদের কাছে ফিরতে হবে। এখনই!

তিনি পালাবার জন্য দ্রুত ফিরতেই একটি তরবারির অগ্রভাগ ঠেকল তাঁর কণ্ঠদেশে। কে যেন কৌতুকের সুরে বলে উঠল, 'আহা, অত উতলা হচ্ছেন কেন ভদ্র। এই তো সবে মিলিত হতে এলেন। কিছু আলাপ পরিচয় হোক। তারপর, রুদ্রসিংহ কী আদেশ দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে আপনাকে?'

দত্তসেনের কণ্ঠে তরবারি দেখেই কিঙ্করীটি আর্তনাদ করতে করতে পালিয়েছিল। দত্তসেন বোধহয় সাহায্যের আশায় ছিলেন। কিন্তু কচগুপ্তর উদ্যত তরবারি তার আর সুযোগ দিল না। সাহায্য এসে পৌঁছবার পূর্বে তাঁর সাধের মস্তকটি ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হতে লাগল।

রক্তস্নাত তরবারিটিকে মাথার উপর ঘুরিয়ে কুমার কচ সগর্জনে বললেন, 'জয় মহামায়া, জয় ভদ্রকালী। ওরে তোরা তোদের অসি কোষমুক্ত কর। আজ শকরক্তে এই ভীমনগরের মৃত্তিকা স্নান করাব, এই

পাপভূমির লজ্জামোচন করব। জয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জয়, জয় কুমার চন্দ্রগুপ্তের জয়।'

অন্যান্য প্রহরীরা এই আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেছিল বটে। তবে দ্রুতই সম্বিৎ ফিরে পেল তারা। আর তৎক্ষণাৎ ভীমরবে দৌড়ে আসতে লাগল গুপ্তসৈন্যদের দিকে। ক্ষুদ্র গুপ্তসৈন্যদলটি মরণপণ সংগ্রামে রত হল শকদের সঙ্গে।

গুপ্তরা খর্বকায় হলে কী হবে, তাদের রণকৌশল অতি সুনিপুণ। তারা প্রাণপণে লড়ে চলল শকপ্রহরীদের সঙ্গে। কিন্তু শকপ্রহরীরা একে আকারে প্রকারে গুপ্তসৈন্যদের দ্বিগুণ, তদুপরি তারা সংখ্যায় অধিক। প্রথম দলটি ভূমিশয্যা নেওয়ার পরেই গুপ্তসৈন্যরা দেখল শকদের দ্বিতীয় দলটিও তাদের দিকে ধাবমান।

ঠিক সেই সময় জয়দ্রথ চিৎকার করে উঠল, 'সাকেত, বিজয়, মুকুন্দ।'

তিন ক্ষীণকায় বঙ্গপুঙ্গব এতক্ষণ কয়েকটি বৃহদাকৃতির প্রস্তরের আড়ালে লুকিয়েছিল। জয়দ্রথের আহ্বান শুনে উঠে দাঁড়াল তারা। আর আগুয়ান শকসৈনিকদের দিকে তাদের বয়ে আনা পুটিকাগুলি মুখ খুলে ছুড়ে দিল।

প্রথমে শকসৈন্যরা বোঝেনি কী উড়ে এল তাদের দিকে। তারপর তারা শিউরে উঠে দেখল তাদের চারিদিক ঘিরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত পার্বত্যসর্পের দল! এতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকা সর্পকুল তাদের ক্রোধফণা মেলে দাঁড়াল অগ্রবর্তী শকসৈন্যদের দিকে। তারপর তারা প্রথমেই যাদের সামনে পেল তাদের উপর ঢেলে দিতে লাগল নিজেদের উগ্রবিষ।

শকসৈন্যরা এই বিষধর ভুজগকুল বড় উত্তমরূপে চেনে। তারা আর্তনাদ করতে করতে দ্রুত সৈন্যাবাসের দিকে ধাবিত হল।

জয়দ্রথ বলল, 'প্রভু এবার তো শয্যা ভবনের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। নইলে শত্রুসৈন্যদল এসে পড়লে তো...'

দুজনেই দৌড়ে গেলেন শয্যাভবনের দিকে। কিন্তু সেই বিশাল দ্বার শত ধাক্কাতেও বিন্দুমাত্র চ্যুত হল না।

নন্দকুমার উদ্বিগ্নক্রোধিতস্বরে বললেন, 'কে তুমি? কোন সাহসে আমার পথরোধ করেছ? তুমি জানো আমি কে?'

অজানা স্বরের কৌতুক আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'জানি বৈ কী। আপনি নন্দকুমার। রুদ্রসিংহ নামক ওই অপোগণ্ডটির পোষ্য সারমেয় বিশেষ।'

সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। নন্দকুমার আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'বাচালতা কোরো না পথিক। তুমি যেই হও, পথ ছাড়ো। রুদ্রসিংহের সেনানীকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার স্পর্ধা কোরো না।'

'আর যদি না ছাড়ি?'

'তাহলে জেনে রাখো যে মহারাজ রুদ্রসিংহের দক্ষতম ঘাতকদল এই মুহূর্তে ওই পর্বতচূড়ায় তীক্ষ্ণাগ্র ভল্ল ও ধনুর্বাণ হাতে আমার সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে। তোমাকে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করতে তাদের মুহূর্তের অধিক সময় লাগবে না।'

কণ্ঠস্বরে ছদ্মহতাশা প্রকাশ পেল, 'তাই বলো। তোমার একার সামর্থ্য নেই আমাকে পরাস্ত করার। সঙ্গী যবনদলের অপেক্ষায় আছ।

এবার চরম ক্ষোভে ফেটে পড়লেন নন্দকুমার। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমার এত স্পর্ধা যে তুমি স্বয়ং নন্দকুমারকে ভীতিপ্রদর্শন করো? সাহস থাকলে প্রকাশ করো নিজেকে। আর কোথায় সেই ছলনাময়ী নারী? দেখি কোন রণ্ডার এত সাহস হয় যে নন্দকুমারকে বিপদে ফেলে!'

সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমারকে ঘিরে একটি বৃত্ত জুড়ে খর্বক্ষুদ্র দণ্ডদীপিকাদল জ্বলে উঠল। নন্দকুমার ভীতভাবে দেখলেন যে তাঁকে ঘিরে কয়েকজন শস্ত্রধারী ভয়ানকদর্শন সৈন্য দাঁড়িয়ে। আর তাঁর ঠিক সামনে একজন রাজবেশধারী প্রৌঢ়। সেই প্রৌঢ়রই তরবারির অগ্রভাগ তাঁর কণ্ঠস্থাপিত।

নন্দকুমার ভীতভাবে বললেন, 'কে আপনি?'

প্রৌঢ় সামান্য হেসে বললেন, 'যাক, তুমি থেকে আপনিতে উন্নীত হয়েছ দেখে ভারি প্রসন্ন হলাম হে। গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন তো ভারতের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, কী বলো?

সে যাই হোক, তোমার প্রশ্নের উত্তরে অবনত মস্তকে জানাই যে অধমের নাম চন্দ্রজ্যোতি। আপাতত মালবদেশ শাসনের দায়িত্বে আছি। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেলাম তোমরা নাকি এতদঞ্চলে আমার জামাতৃদেবের সঙ্গে সসৈন্যে সাক্ষাৎ করতে এসেছ। তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একবার আলাপ করেই যাই। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তোমাকে তেমন সুখী বলে মনে হচ্ছে না, কেন বলো তো?'

নন্দকুমার বিস্ফারিত চোখে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কোনও শব্দ স্ফুট হল না।

চন্দ্রজ্যোতি ছদ্মউদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'তবে একটি কথা। যে কন্যাটির কাতর আহ্বানে তুমি নিজের মস্তকটি এখানে দান করতে এসেছ, তিনি আমার কন্যাসমা, নাম মন্দা। তাঁকে রণ্ডা সম্বোধন করে ভালো করোনি হে। তোমার অশ্লীল কুবাক্যে তিনি সামান্য কুপিতা হয়েছেন। কী রে মন্দা, কিছু বল মা।'

নন্দকুমারের হস্তপদ শিথিল হয়েই গেছিল। তাই যখন তিনি দেখলেন যে মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির পেছন হতে মন্দা নামের সেই মোহময়ী নারী একটি বিচিত্রদর্শন খড়্গহস্তে আবির্ভূতা হলেন, তখন তিনি কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। এমনকী যখন সেই মহাখড়্গ তাঁর মস্তকটি স্কন্ধচ্যুত করল, তখনও না।

চন্দ্রগুপ্ত আর রুদ্রসিংহ মহাঘোররবে মল্লযুদ্ধে ব্যপৃত হলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বলশালী এবং বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। তিনি মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করেছেন পাটলিপুত্রর শ্রেষ্ঠ মল্লবিদ চাণুরের কাছে। প্রবল মুষ্ট্যাঘাত এবং জরাসন্ধি কীলক প্রয়োগে তিনি রুদ্রসিংহকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

রুদ্রসিংহ একে মহাকায়, তদুপরি মল্লযুদ্ধে অতিরথ। তিনি চন্দ্রগুপ্তর প্রাথমিক আক্রমণ অনায়াসে সহ্য করে প্রতি আক্রমণে রত হলেন। চন্দ্রগুপ্ত বুঝলেন যে প্রতিপক্ষ তাঁর থেকে বহুগুণে উত্তম। হয়তো তরবারি সঙ্গে থাকলে তিনি উপযুক্ত উত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু নারীবেশ ধারণ করতে গিয়ে তিনি তরবারিটি রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্রুবার আতঙ্কিত চোখের সামনে রুদ্রসিংহ ভূপাতিত করলেন চন্দ্রগুপ্তকে। চন্দ্রগুপ্ত মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারালেন।

রুদ্রসিংহ এবার ধ্রুবার দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখে লোলুপতার পরিবর্তে ফুটে উঠেছে মত্ত জিঘাংসা। কোনও সাধারণ নারী হলে এই দানবীয় রুদ্ররূপ দেখামাত্র ভয়েই অর্ধমৃতা হতেন। কিন্তু ধ্রুবা নিজেও একজন দক্ষ সমরকুশল যোদ্ধনারী। মহাক্রোধে রুদ্রসিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ধ্রুবা। অস্ত্র বলতে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী খর্ব ছুরিকাখানি। তাঁর প্রথম আঘাতেই রুদ্রসিংহের বাহুতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। রুদ্রসিংহ ধ্রুবাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন। কিন্তু ধ্রুবা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে রুদ্রসিংহের জানুতে ছুরিকাঘাত করলেন।

কিন্তু এইসব ছোটখাটো রক্তপাত রুদ্রসিংহের কাছে কিছুই না। তদুপরি তিনি ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় আছেন। তিনি চুলের মুঠি ধরে ধ্রুবাকে শয্যায় উপর আছড়ে ফেললেন। তারপর উগ্রস্বরে বললেন, 'স্তব্ধ হ রে কুলটা। আগে তোর প্রেমাস্পদকে হত্যা করি, তারপর দেখি তোর যৌবনজ্বালা কতদূর বর্ধিত হয়েছে। আজ শুধু

আমি নয়, ভীমনগর দুর্গের প্রতিটি শকসৈন্য ভোগ করবে তোকে।' বলতে বলতেই রুদ্রসিংহ সামান্য নীচু হয়ে ধ্রুবার কঞ্চুলিকাটি ছিঁড়ে নিলেন, তারপর সেটি ছুড়ে দিলেন কক্ষের একপাশে।

ধ্রুবা প্রাণপণে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন বটে, কিন্তু রুদ্রসিংহের বিপুল শক্তির সামনে তিনি প্রকৃতই অসহায়। রুদ্রসিংহের একটি চপেটাঘাত তাঁকে প্রায় অচেতন করে দিল। ধ্রুবা বুঝতে পারলেন, রুদ্রসিংহ এবার তাঁর নীবিবন্ধে হাত দিয়েছেন। আর বোধহয় কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই তাঁর বরতনু সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়বে এই রাক্ষসের সামনে...

ঠিক সেইসময় পেছন থেকে একটি বস্ত্রখণ্ড এসে চেপে বসল রুদ্রসিংহের গলার উপর। ধ্রুবা সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর ছিন্ন কঞ্চুলিকাটি!

রুদ্রসিংহ মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। ধ্রুবা এবার আর ভুল করলেন না। ছুরিকাটি তাঁর ডানহাতের সামনেই পড়ে ছিল। হাতখানি মুক্ত হতেই তিনি ছুরিকাটি তুলে সজোরে রুদ্রসিংহের বাম চোখে প্রোথিত করে দিলেন!

মরণান্তিক আর্তনাদ করে উঠলেন রুদ্রসিংহ। আর চন্দ্রগুপ্ত চিৎকার করে উঠলেন, 'ধ্রুবা...আবার...'

ধ্রুবা আর দেরি করলেন না। এবার ছুরিকাটি খুলে নিয়ে প্রোথিত করে দিলেন রুদ্রসিংহের ডান চোখেও!

উঠে দাঁড়ালেন রুদ্রসিংহ। এক ঝটকায় ছুড়ে ফেললেন চন্দ্রগুপ্তকে। তারপর অত বড় শরীরটা মাটিতে পড়ে আহত পশুর মতো আর্তচিৎকার করতে থাকল।

চন্দ্রগুপ্ত নিজের উত্তরীয় এবং কায়াবন্ধটি ধ্রুবার দিকে ছুড়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'নিজেকে আবৃত করুন মহাদেবী। আর শয্যাভবনের দ্বার উন্মুক্ত করুন। ভয় নেই, কচ ওখানেই আছে।'

কচ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্যরা শতচেষ্টাতেও ভবনের দরজা উন্মুক্ত করতে পারলেন না। এদিকে শকসৈন্যরা এসে পড়েছে প্রায়। ওই শোনা যায় তাদের ভীমকলরব।

জয়দ্রথ বললেন, 'প্রভু, এবার উপায়?'

কচগুপ্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন। তিনি জগজ্জয়ী মহাবীর সমুদ্রগুপ্তর পরিবারের সন্তান। মরতে বা মারতে ভীত হন না। কিন্তু আপাতত জ্যেষ্ঠ এবং মহাদেবীকে উদ্ধার করা আশুকর্তব্য।

খানিকক্ষণ দরজায় কান পেতে কী যেন শুনলেন কচ। কই, কোনও যুদ্ধহুঙ্কারের শব্দ তো শোনা যায় না। তাহলে কি সব কিছু পরিকল্পিতরূপে সুসম্পন্ন হয়নি? জ্যেষ্ঠ কি সক্ষম হননি রুদ্রসিংহের নিধনে? আর মহাদেবী? তাঁর কী হল?

কচগুপ্তর করতল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তিনি উত্তেজনা এবং উদ্বেগে অধীর হয়ে উন্মত্তের মতো পদাঘাত করতে গেলেন শয্যাভবনের দ্বারে।

কিন্তু তার আগেই হঠাৎ শয্যাভবনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। কচ এবং তাঁর সঙ্গীরা সচকিত হয়ে দেখলেন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন মহাদেবী ধ্রুবা। তাঁর অঙ্গবেশ বিস্রস্ত, চুল উড়ছে ক্ষুব্ধ সর্পিণীর মতো। তাঁর দুচোখে আগুন, আর তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে রক্ত!

আর তাঁর ঠিক পিছনে আর্তনাদরত রুদ্রসিংহের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছেন চন্দ্রগুপ্ত। মনে হচ্ছে যেন কোনও অতিকায় মহাষণ্ড শিকার করে তাকে আকর্ষণ করে আনছেন অরণ্যাধিপতি মৃগরাজ। রুদ্রসিংহের সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তাক্ত। তাঁর মুখ থেকে পাশব আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। তিনি চেষ্টা করছেন চন্দ্রগুপ্তর জানু ধরে তার গতি ধীর করার। কিন্তু রণোন্মত্ত রক্তপিপাসু কেশরীকে প্রতিহত করে এমন সাধ্য কার?

কুমার চন্দ্রগুপ্তকে দেখে ভীত হলেন কচ। আজন্মকাল ধরে যে জ্যেষ্ঠকে দেখে এসেছেন কচ, তাঁর সঙ্গে এই চন্দ্রগুপ্তর কোনও সাযুজ্য নেই। এই কালভৈরবসদৃশ কালক্রোধী, মহাউন্মত্ত চন্দ্রগুপ্তকে কখনও দেখেননি তিনি। কচের সমস্ত হাত পা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তবে এই স্তম্ভন সাময়িক। কচকে দেখামাত্র তাঁর নাম ধরে চিৎকার করে উঠলেন চন্দ্রগুপ্ত। আর তৎক্ষণাৎ কচের হাতে পায়ে সাড় ফিরে এল। এই আহ্বানের অর্থ জানেন কচ। মুহূর্তের মধ্যে নিজের তরবারিটি ছুড়ে দিলেন চন্দ্রগুপ্তের হাতে। চন্দ্রগুপ্ত সেই তরবারি হাতে নিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'জয় মহামায়া, জয় ভদ্রাকালী।' বলেই রুদ্রসিংহকে ছুড়ে ফেললেন সবার সামনে। আর তারপর এক কোপে কেটে ফেললেন রুদ্রসিংহের মাথা।

রুদ্রসিংহের দেহকাণ্ডটি ধড়ফড় করতে লাগল। মুণ্ডটি গড়িয়ে এল সোপানের দিকে। কচগুপ্ত টেনে নিলেন জয়দ্রথর হাতের ভল্লটি। তারপর রুদ্রসিংহের মস্তকটি সেই ভল্লাগ্রে গ্রথিত করে এগিয়ে গেলেন আগুয়ান শকসৈন্যদের সামনে। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আয় তোরা, আয়। দেখি কার সাহস আছে কুমার চন্দ্রগুপ্তর সেনানীর সামনে এসে দাঁড়াবার!'

ধাবমান শকসৈন্যরা থমকে গেল। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তারা।

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে গুপ্তশিবিরে প্রবেশ করলেন তখন শেষরাত্রি। রামগুপ্ত এবং তাঁর পারিষদবর্গ তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে এই মহাবিপদ হতে উদ্ধার পেয়েছেন তাঁরা।

শ্বশুরের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ হল রামগুপ্তর। আর সে সাক্ষাৎ মোটেও সুখের হল না। রামগুপ্ত জীবনে এমন সুতীব্র ভর্ৎসনার মুখোমুখি হননি। তাঁর প্রতি এমন কঠোর পরুষ বাক্য যে কেউ প্রয়োগ করতে পারে, সে তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে প্রয়াত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর মহান উত্তরাধিকার এমন একজন অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং স্বার্থপর মানুষের উপর বর্তেছে। আমি এও জানি না আমার কোন পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে এমন কাপুরুষ ও নপুংসক মানুষের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল।'

রামগুপ্ত এমনিতেই লজ্জা এবং অসম্মানের গ্লানিতে পীড়িত ছিলেন। মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি সঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে যে কী হত সে কথা ভাবতেও হৃৎকম্প হচ্ছে তাঁর। তাই এই প্রবল ভর্ৎসনার কোনও উত্তরই দিতে পারলেন না তিনি।

শিখরস্বামী বললেন, 'আপনি শান্ত হোন রাজন। নিজের জামাতা তথা গুপ্তসাম্রাজ্যের সম্রাটের প্রতি এমন অশোভন বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত অনুচিত।'

'কেন মহামাত্য? অনুচিত কেন? আমি তো চাইনি রামগুপ্তর সঙ্গে ধ্রুবার পরিণয় হোক। আমি তো কুমার চন্দ্রগুপ্তকে আমার জামাতারূপে চেয়েছিলাম। আমার কন্যারও তাই মনোবাসনা ছিল। আপনারা কোন স্পর্ধায় তার অনুমতি না নিয়ে তার সঙ্গে অন্য একজনের বিবাহ সম্পন্ন করলেন?'

শিখরস্বামী বোঝাতে সচেষ্ট হন, 'যেহেতু কুমার কচ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন...'

'কুমার কচ-এর প্রতিজ্ঞাই বড় হল? আর আমার কন্যার ইচ্ছার কোনও মূল্য নেই?'

'আপনার কন্যাও তো এই বিবাহে তাঁর অসম্মতি জানাতে পারতেন।'

'বাহবা মহামাত্য, বলিহারি জানাই আপনার বুদ্ধিকে। কী অসাধারণ কথাই না শোনালেন। আমার কন্যা বিবাহের জন্য সেই সুদূর মালব হতে পাটলিপুত্র এসে দেখল তার জন্য অন্য পতি নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপর সে এই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে আবার মালবে ফিরে যাবে। লোকে বলবে, ওই দেখো, মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির

দুর্ভাগা কন্যা। বিবাহের জন্য মহা আড়ম্বর করে গেছিল সেই সুদূর মগধে। আর তারপর তাকে পাটলিপুত্রের রাজপরিবার প্রত্যাখান করেছে বলে অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এসেছে।'

'বিশ্বাস করুন মহারাজ, আমরা তা চাইনি বলেই...'

'চাননি বলেই তাকে অন্য আরেকজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন তাই তো? শুধু আপনাদের ওই প্রতিজ্ঞারক্ষা নামক প্রহসনের জন্য তাকে আজীবন এই বিপুল অসম্মানের বোঝা বহন করে যেতে হবে, তাই চেয়েছিলেন আপনারা? নিজের সম্মানরক্ষার জন্য, নিজের পিতার সম্মানরক্ষার জন্য, নিজের পিতৃবংশের সম্মানরক্ষার জন্য নিজেকে পাটলিপুত্রের অহংকারের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে সে।'

দত্তাদেবী এতক্ষণ সব কথা শুনছিলেন। এবার কঠিনস্বরে বললেন, 'আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবেন না মহারাজ। মনে রাখবেন, গুপ্তবংশের কাছে আপনার অনেক ঋণ আছে।'

'আছে নয় রাজমাতা, ছিল। আজ কয়েক প্রহর পূর্বে আপনাদের সবংশে উদ্ধার করে সেই ঋণ পরিশোধ করেছি। নইলে এতক্ষণে আপনাদের মৃতদেহ জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে পড়ে থাকত এখানে। আর আপনাদের যুবতী ও তরুণী নারীদের যৌনদাসী করার জন্য ভীমনগর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হত।'

দত্তাদেবী থমকে যান। এর থেকে রূঢ়তর সত্য আর হয় না।

'আর তারপর আমি জানতে পারলাম মহান সমুদ্রগুপ্তর সন্তান, গুপ্তবংশের সম্রাট, মহাবীরোত্তম বীরশিরোমণি শ্রীযুক্ত রামগুপ্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের ধর্মপত্নীকে অন্য এক দস্যুর হাতে রক্ষিতারূপে তুলে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। যেন আমার কন্যা তাঁর স্থাবর সম্পত্তি, ইচ্ছে করলেই তিনি তাকে দান করতে পারেন। আমার স্নেহের পুত্তলি যেন বহুভোগ্যা নারী, ইচ্ছেমতো তাকে ভোগ করা যায়, ইচ্ছেমতো তাকে অন্য কারও ভোগ্যবস্তুরূপে প্রেরণ করা যায়, তাই না রাজমাতা?'

অসহ্য ক্রোধে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল মহারাজ চন্দ্রজ্যোতির। মন্দা পিছন হতে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, 'শান্ত হোন জ্যেঠ। শুনেছি ধ্রুবা একা যায়নি সেই রাক্ষসের কাছে। কুমার চন্দ্রগুপ্তও তার সঙ্গে ছিলেন। এবং খুব সম্ভবত কুমার কচ-ও। তাঁরা থাকতে ধ্রুবার কোনও বিপদ হতে পারে না জ্যেঠ।'

'সেই আশাতেই আছি রে মা', কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন পিতৃহৃদয় আর বাধ মানল না। অবিরল অশ্রুবারিতে ভেসে যেতে লাগল মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতির প্রশস্ত বুকখানি, 'একবার ফিরে পাই আমার ধ্রুবাকে, আমি তাকে জোর করে হোক, হাতে পায়ে ধরে হোক, যে করেই হোক মালবে নিয়ে যাব। সে থাকবে আমার কাছে সারাজীবন, কোথাও পাঠাব না তাকে। আমার আর কিছু চাই না রে মা, শুধু আমার মেয়েকে যেন সুস্থ ফিরে পাই।'

গুপ্তরাজপুরুষেরা নতমস্তকে নির্বাক নিস্তব্ধ বসে রইলেন। একা রামগুপ্ত নন, অপরাধী তো তাঁরা প্রত্যেকে।

তবে বেশিক্ষণ নয়। একটু পরেই কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সভার মধ্যে। প্রহরীরা শশব্যস্ত হয়ে তাকে তুলে ধরল। সূর্যস্বামী এতক্ষণ ম্রিয়মাণ হয়ে এককোণে বসে ছিলেন। আগন্তুককে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে এ যে জয়দ্রথ, কুমার কচের দেহরক্ষী। কী সংবাদ এনেছ জয়দ্রথ?'

জয়দ্রথ শায়িত অবস্থাতেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভীমনগর দুর্গের পতন হয়েছে। কুমার চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রুদ্রসিংহ নিহত। কুমার, মহাদেবী এবং প্রভু কচগুপ্ত সুস্থ আছেন। আমার আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছা করছে প্রভু...' বলেই হাসিমুখে জ্ঞান হারালো জয়দ্রথ।

রামগুপ্ত একবার চতুর্দিকে তাকালেন। তারপর উদাত্ত গম্ভীর স্বরে শুরু করলেন, 'আজ গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক মহান দিন। শকাধিপতি রুদ্রসিংহর এই পরাজয় গুপ্তবংশের গরিমা এবং সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করেছে। আজ এই পুণ্যলগ্নে আমি ঘোষণা করছি কাল প্রাতে যেন মহাবিষ্ণুপূজার আয়োজন করা হয়।'

চন্দ্রগুপ্ত এগিয়ে এসে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'তার পূর্বে আমার কিছু নিবেদন আছে।'

'বলুন কুমার।'

চন্দ্রগুপ্ত একবার সভাস্থ প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। প্রত্যেকে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত, একমাত্র মহাদেবী ধ্রুবা ব্যতীত। গুপ্তমহাদেবী, পট্টমহারানি ধ্রুবা সভার একপ্রান্তে বসে থাকা পিতার ক্রোড়ে গিয়ে সেই যে মুখ লুকিয়েছেন, তারপর থেকে তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই।

'গত দুদিনের ঘটনায় আমরা প্রত্যেকেই বিপর্যস্ত, আহত এবং প্রভূত বিচলিত। মহাক্ষমতাশালী, অর্ধজম্বুদীপের অধিপতি গুপ্তবংশের ওপর যে এমন আঘাত নেমে আসতে পারে, সে আমাদের কল্পনারও অগোচর ছিল। অথচ সেই আপাতসম্ভব ঘটনাটিই ঘটেছে। কিন্তু কীভাবে? কোন মন্ত্রবলে ওই বর্বর শকদস্যুর এত বড় স্পর্ধা হল গুপ্তসাম্রাজ্যের ওপর এত বড় আক্রমণ চালাবার?

এখন সেই কাহিনিই বলব।

আমরা সবাই জানি, বা অন্তত স্বীকার করি যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে রাজ ক্ষমতা অধিকারের জন্য বিভিন্ন শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাজপারিষদবর্গের অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে সম্রাট আমাকেই তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ হয়তো অন্য বাসনা পোষণ করেছিলেন।'

সভাস্থল নিস্তব্ধ। অস্বস্তি এড়াতে রামগুপ্ত বলে উঠলেন, 'তুমি কী ইঙ্গিত করছ ভ্রাতা? আমি তোমাকে ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন হতে বঞ্চিত করেছি?'

চন্দ্রগুপ্ত হাত তুলে স্তব্ধ করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, 'আজ অবধি আপনার সব কথা বিনা প্রশ্নে শুনে এসেছি জ্যেষ্ঠ। কিন্তু আজ নয়। আজ আমার বলার দিন। আজ আমাকে এক রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতেই হবে।

'আমার মনে হয়েছিল যে পিতার অন্তিম সময়কালে আমাকে মালবে প্রেরণ করা এক বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। কেউ কেউ চাননি আমি পিতার মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকি। এমনকী পরে ঘটনাপর্ব বিচার করে, এবং বেশ কিছু সূত্র বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি যে ঠিক ওই সময়েই রুদ্রসিংহের মালব আক্রমণও এক অভিনয় ছিল। যাতে পিতা তাঁর বাল্যবন্ধুর চরম সঙ্কটে আমাকেই প্রেরণ করেন।

'তারপর কী কী ঘটে তার বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়। কেবল আমার মনে ক্রমেই এই চিন্তা দৃঢ়তর হতে থাকে, কোথাও কোনও এক অতি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে।

'পূর্বতন সম্রাটের রাজত্বের সময়ে বেশ কিছু রাজপুরুষের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। সে প্রণয় প্রথম থেকেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কারণ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অতি বিচিত্র। আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের পরেও তাঁরা আমার সঙ্গ ছাড়েননি, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

'পক্ষকাল পূর্বে তাঁদেরই একজন একটি অতি সুশিক্ষিত পারাবতের মাধ্যমে আমাকে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। কীভাবে সেই পারাবত আমাদের চলমান বিজয়শোভাযাত্রার সন্ধান পেল তার বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না। সেই বার্তায় একটি শঙ্কর কথা লিখেছিলেন আমার বিশ্বস্ত সেই রাজপুরুষ। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন একটি অদ্ভুতদর্শন মূক ও বধির বামনের মাধ্যমে কোনও গোপন সংবাদ পাটলিপুত্রের বাইরে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে বহিরঙ্গে সে একটি অতি নিরীহ পত্র বহন করছিল। সেই পত্রে কিছু বিশেষ সাংসারিক বার্তা ছিল।'

উঠে দাঁড়ালেন দনুজদমন, 'কুমার কি সেই মূক ও বধির বামনের কথা বলছেন যে আপাতত আমার গৃহভৃত্যরূপে নিযুক্ত?'

'হ্যাঁ। তার কাছ হতে অবশ্য সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু একটি বিশেষ শস্ত্রী উদ্ধার হয়, যা মগধের ক্ষৌরকারদের ব্যবহৃত শস্ত্রী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

বিচলিত হলেন দনুজদমন, 'মগধে অপ্রচলিত শস্ত্রী সঙ্গে রাখা তো তো কোনও অপরাধ নয় কুমার। আর সে যদি আমার কোনও পারিবারিক বার্তা নিয়েই আসে, তাহলে সে গেল কোথায়?'

'রহু ধৈর্যং প্রাজ্ঞ সেনাপতি মহোদয়। সব বলছি।

'আমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই বার্তায় সেই বামন কিশোরের আরও একটি বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করা ছিল। তার কেশরাজি অতি ঘন এবং বৃহদাকার। এবং তার বৃদ্ধির হারও অস্বাভাবিক দ্রুত। ফলত সেই বামনকে প্রতি পক্ষকালে একবার নিজের মস্তক সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডন করতে হয়।'

আবারও উঠে দাঁড়ালেন দনুজদমন, 'এও তো কোনও অপরাধ নয় কুমার।'

'না, আপাতদৃষ্টিতে নয়। কিন্তু গণনা করে দেখলাম যে বেগবান অশ্ব তাকে দেওয়া হয়, তাতে তার বহু পূর্বেই আমাদের শিবিরে পৌঁছে যাওয়ার কথা। অথচ তার কোনও চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে সে গেল কোথায়?

'আমি অন্যভাবে অনুসন্ধানে ব্যপৃত হই। অনুমান করেছিলাম সেই বামন পূর্বী ভারতের বাসিন্দা নয়। এও জানা যায় যে, দনুজদমন হিমালয়ে তীর্থ করতে এসে এই বামনকে পান।

'অনুমান করি ওই বিশেষ শস্ত্রীটি এই অঞ্চলের হবে। আমি ত্রিগর্ত এবং নাগরকোটের গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন ক্ষৌরকারদের কাছে ঘুরতে থাকি ওই বিশেষভাবে প্রস্তুত শস্ত্রীটির বিবরণ নিয়ে। আর কয়েকদিন আগেই এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সেই বামনের সন্ধান পাই, আর মা ভদ্রকালীর কৃপায় আমার সামনে সমস্ত রহস্য উন্মুক্ত হয়।

'তার পূর্বে, বলুন তো দনুজদমন, এই মূক ও বধির বামনকে আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?'

দনুজদমনকে এখন স্পষ্টতই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বিচলিতস্বরে বললেন, 'আআআমি এনেছিলাম বটে। কিন্তু আমি এর প্রকৃত প্রভু নই। আমার তীর্থযাত্রার সঙ্গী এই বামনকে ক্রয় করে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু কুমার এখনও স্পষ্ট হল না অকস্মাৎ আমার গৃহভৃত্যটি আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন?'

'কারণ এই বামন প্রকৃতপক্ষে রুদ্রসিংহের চর। কুটিল, নৃশংস এবং মহাধূর্ত এই বামনটি শকগুপ্তচরবাহিনীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। আর যে বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষ গুপ্তবংশের সামূহিক সর্বনাশসাধনে গোপনে রুদ্রসিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে রত হয়েছিলেন, তিনিই সেই চরকে এনে আপনার হাতে সমর্পণ করেন।'

দ্বারের কাছ হতে মহা কোলাহল উপস্থিত হল। কেউ বোধহয় গোপনে সভাকক্ষ ত্যাগের উদ্যোগ করছিলেন। কচগুপ্ত উচ্চৈস্বরে বললেন, 'মুকুন্দ, বিজয়, দেখো কেউ যেন পালাতে না পারে।'

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল সভাদ্বারের দিকে। সেখানে দুই প্রহরীর হাতে বন্দি হয়ে ক্রোধে ফুঁসছেন গুপ্তসাম্রাজ্যের অনেক উত্থান পতনের সাক্ষী, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর প্রিয়তম বয়স্য, মহামাত্য শিখরস্বামী।

চন্দ্রগুপ্ত ধীরপায়ে এগিয়ে এলেন শিখরস্বামীর দিকে। তারপর শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এই বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে রুদ্রসিংহ কী দিতে চেয়েছিলেন মহামাত্য? অতুল ঐশ্বর্য? রাজ্যপাট? গুপ্তসাম্রাজ্যের নিঃসপত্ন অধিকার?

ফুঁসে উঠলেন শিখরস্বামী, 'কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে কুমার? বিনা দোষে আমাকে অভিযুক্ত করছেন কেন? এতদিন নিঃস্বার্থভাবে রাজসেবার এই পুরস্কার?'

তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'আপনার প্রমাণ চাই? এই দেখুন।' বলেই সভার অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা কার দিকে যেন ইঙ্গিত করলেন তিনি।

একটু পরেই সে অন্ধকার কোণ থেকে গোলমতো কী যেন একটা গড়িয়ে এল। সভাস্থ সকলে শিউরে উঠে দেখলেন, একটি কর্তিত মুণ্ড। আর তার মুণ্ডিত মস্তক জুড়ে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে কী যেন লেখা!

চন্দ্রগুপ্ত কঠিনস্বরে বললেন, 'কী মহামাত্য, চিনতে পারেন এ মুণ্ড কার? আর তার মাথায় কার হস্তাক্ষরে কী লেখা?'

শিখরস্বামীর মাথা নুইয়ে এল। বাকিরা বজ্রাহত বৃক্ষকাণ্ডের মতো বসে রইলেন।

মহারাজ চন্দ্রজ্যোতি বিহ্বলস্বরে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে কুমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'এই বামন ছিল রুদ্রসিংহের একান্ত অনুগত দাস। তার মতো অত্যন্ত চতুর, হিংস্র, এবং নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ দ্বিতীয়টি হয় না। সে মূকও নয়, বধিরও নয়। আমি নিজে তার প্রমাণ পেয়েছি।

'এই বামনের একটি আশ্চর্যরকম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কেশরাজি অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বর্ধিত হয়। আর সেই বৈশিষ্ট্যকে কী সুচতুরভাবে নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছিলেন রুদ্রসিংহ এবং তাঁর সঙ্গী শিখরস্বামী সে কথা আমরা পরে শুনব।

'শিখরস্বামী চেয়েছিলেন গুপ্তসম্রাটকে প্রভাবিত করে তাঁকে এবং তাঁর পারিষদবর্গকে সপরিবারে ভীমনগর দুর্গে এনে বন্দী করতে। এ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন তাঁর পুত্র সূর্যস্বামী। কিন্তু দিনক্ষণ সহ সেই পরিকল্পনাটি তিনি রুদ্রসিংহকে জানাবেন কী করে? তিনি বিচক্ষণ মানুষ। অনুমান করেছিলেন যে আমার অনুগত রাজপুরুষ এবং গুপ্তচরবাহিনী বেঁচে থাকতে কোনও সন্দেহজনক সংবাদ পাটলিপুত্রের বাইরে যেতে দেবে না।

'আমার ধারণা রুদ্রসিংহও তাইই অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর প্রিয়তম ভৃত্যকে শিখরস্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাকে মূক ও বধির সাজানো হয়েছিল যাতে তার কথা শুনে লোকে অনুমান না করতে পারে যে কোন জাতির লোক।

'উপযুক্ত সময় যখন এল, তখন শিখরস্বামী পরিকল্পনা মতো বামনের মস্তক মুণ্ডন করলেন। মুণ্ডিত মস্তকের ওপর স্বহস্তে সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে পরিকল্পনাটি লিখলেন। পক্ষকাল তাকে নিজের কাছে রাখলেন যাতে কেউ তার মুণ্ডিত মস্তক দেখতে না পায়। তারপর তার কেশরাজি পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে তাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিলেন দনুজদমনের গৃহে। আর কাহিনির বাকিটা তো আমরা এখন জানিই।

'কিন্তু কুমার', আবার মুখ খুললেন দনুজদমন, 'একটি কূট প্রশ্ন তো রয়ে গেল। সেই বামন যদি কথা বলতেই পারে, তাহলে তার মুণ্ডিত মস্তকে বার্তা লিপিবদ্ধ করে পাঠাবার প্রয়োজন কী? সে তো বার্তাটি মুখে মুখেই দিতে পারত।'

'আপনার কাছে এই প্রশ্ন আশা করিনি মাননীয় দনুজদমন। আপনি বহুদিন যাবৎ গুপ্তসাম্রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আমাদের কারও চাইতে কম নয়।

গূঢ়লেখ প্রেরণের মূল বিষয় হচ্ছে বার্তার অভ্রান্ততা। দূত যে বার্তাটি দিচ্ছে সেটি যে সঠিক তার প্রমাণ কী? হতে পারে ইতিমধ্যেই তার আনুগত্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সে এখন উভয়বেতনচারী। সে যে তার নতুন প্রভুর আজ্ঞার বশবর্তী হয়ে পুরাতন প্রভুর কাছে ভুল সংবাদ বহন করে আনছে না তার নিশ্চয়তা কী?

রুদ্রসিংহ তাঁর প্রতি প্রেরিত বার্তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তাই এত সতর্কতা। বার্তাটি ওই বামনের দ্বারা আনীত হতে হবে, এবং শিখরস্বামীর হস্তাক্ষরে লিখিত হতে হবে, এই দুটি শর্ত একত্রে পালিত হলে তবেই রুদ্রসিংহ নিঃসন্দেহ হবেন যে গূঢ়লেখটি সঠিক ও অভ্রান্ত।

'তবে আরেকজনের কাছে আমি ঋণী। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় এক অসামান্য কবিপ্রতিভার সন্ধান পেয়েছি আমি। ইনি কশ্যপমীরের অধিবাসী। শকদের কশ্যপমীর অভিযানের সময় স্ত্রী সন্তান হারিয়ে কোনওমতে মৃতপ্রায় অবস্থায় নাগরকোটের এক পার্বত্য গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তিনিই চিনতে পেরেছিলেন নিরীহ, মূক ও বধির মুখাবরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এই কুৎসিত মানুষটিকে।'

সভাসদেরা ঘুরে তাকালেন অন্ধকার কোণটির দিকে। সেখানে মলিন বেশধারী এক অপূর্বকান্তি যুবক দাঁড়িয়ে। তাঁর ভাবলেশহীন মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

রামগুপ্ত একবার চতুর্দিকে তাকালেন। তারপর শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কুমার চন্দ্রগুপ্ত যে কাহিনি বিবৃত করলেন, তার যাথার্থ্য নিরূপণের প্রয়োজন আছে। বিনা প্রমাণে আমি গুপ্তবংশের এতদিনের অনুগত অমাত্যকে শাস্তি দিতে পারি না। আপাতত বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করা যাক। আজ গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক মহান দিন। শকাধিপতি রুদ্রসিংহর এই পরাজয় গুপ্তবংশের গরিমা এবং...'

'স্তব্ধ হোন সম্রাট!' চন্দ্রগুপ্ত হাত তুলে বলে উঠলেন, 'আপনার মুখে গুপ্তবংশের গরিমার কথা মানায় না। আপনি শুধুমাত্র নিজের প্রাণরক্ষার্থে গুপ্তবংশের সম্রাজ্ঞী, পট্টমহিষী ধ্রুবাকে শত্রুর অঙ্কশায়িনী হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। এই ঘোর অপমান, এই ঘোর অসম্মান যিনি মেনে নিতে পারেন, তাঁকে গুপ্তসম্রাটরূপে মেনে নিতে আমি অপারগ।'

রামগুপ্ত পুনর্বার জিহ্বা দিয়ে নিজের শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করেন। চারিদিকে গুপ্তরাজপরিষদের রাজন্যবর্গ। তাঁদের মুখ কঠিন। যেন অলঙ্ঘ্য নিয়তির মতো তাঁরা নিষ্পলকে দেখে চলেছেন এই নাটিকাখানি।

রামগুপ্ত অশনি সঙ্কেতটি বুঝলেন। ছল করে সম্রাট হওয়ার পর থেকে যে ভয় তিনি পাচ্ছিলেন, অবশেষে তাই ঘটতে চলেছে। কুমার চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহী হয়েছেন!

আর সভাসদরা যদি কুমারকে বাধা না দেন, তার একটিই অর্থ হয়। তিনি সিংহাসনে থাকতে পারেন বটে, কিন্তু রাজশাসনের নৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছেন। তবুও তিনি মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলেন, 'আমি মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত...' বলতে বলতে রামগুপ্তর স্বর কেঁপে গেল।

'না জ্যেষ্ঠ,' এইবার শোনা যায় তরুণ কচগুপ্তর দৃঢ়, অনমনীয় স্বর, 'আপনি গুপ্তসাম্রাজ্যের মহারাজাধিরাজ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। যিনি বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্যের গৃহলক্ষ্মীকে শত্রুশিবিরে রক্ষিতারূপে প্রেরণ করতে পারেন, তিনি নিজের রাজত্ব রক্ষা করবেন কী করে? প্রজাপালন করবেন কী করে? আমি আপনার রাজশাসনের অধিকার অস্বীকার করছি।'

পারিষদদল মূক, স্তব্ধবাক!

কুমার চন্দ্রগুপ্ত চারিদিকে তাকালেন একবার। যেন বুঝে নিতে চাইলেন পরিস্থিতি। শেষে তিনি তাকালেন মহাদেবী ধ্রুবার জ্বলন্ত চোখদুটির দিকে। তারপর নিজ তরবারি কোষমুক্ত করে মন্দ্রস্বরে বললন, 'মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের শেষ ইচ্ছানুসারে আমি, কুমার চন্দ্রগুপ্ত, নিজেকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ঘোষণা করছি। কেউ যদি আমার বিরোধিতা করতে চান, তো আসুন। আমাকে পরাস্ত করুন।'

কোষমুক্ত অসিহাতে দীপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। মনে হল যেন দক্ষসভায় উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ং রুদ্র। পরক্ষণেই কুমার কচ এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে, যেন রুদ্রের পাশে বজ্রধারী ইন্দ্র। তারপর একে একে তাঁদের সেনানীদল উন্মুক্ত অসিহস্তে ঘিরে দাঁড়াল তাঁদের।

বলাবাহুল্য, কেউই অগ্রসর হল না। বোঝা গেল যে কেউ অগ্রসর হতে চায়ও না। পারিষদদল জেনে গেছেন যে রামগুপ্তকে আর মহারাজাধিরাজ বলে স্বীকার করার অর্থ হয় না।

দনুজদমন এগিয়ে এলেন। বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'নিয়তির কী পরিহাস। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হল বটে, তবে সে যে এইভাবে ঘটবে সে আমার কল্পনার বাইরে ছিল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত নিজের উত্তরাধিকারী চিনে নিতে ভুল করেননি। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদেরই পাহাড়প্রমাণ মূর্খতার পরিচয়ে গুপ্ত বংশকে আজ এই ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল।'

বলতে বলতেই তিনি কুমার চন্দ্রগুপ্তর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর করজোড়ে, নতমস্তকে বললেন, 'জয় মহাজারাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!'

মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের জয়জয়কারে সভা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নিয়তির বিধান কী বিচিত্র। কয়েক দণ্ড পূর্বেই যারা রামগুপ্তকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিল, এখন তারাই নতুন সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

এগিয়ে এলেন রাজপুরোহিত। চন্দ্রগুপ্তর ললাটে এঁকে দিলেন রাজতিলক। তারপর ঘোষণা করলেন, 'মহারাজের বিধিমতো অভিষেক হবে পাটলিপুত্র পৌঁছে। এখন সম্রাট আদেশ দিন, এই সভা পরিষদ ভঙ্গ করা হোক।'

এতক্ষণ দত্তাদেবী সভার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, 'বেশ, পরিষদসভার ইচ্ছেই তাহলে শিরোধার্য করলাম। সেক্ষেত্রে আমি, আমার পুত্র রামগুপ্ত এবং পুত্রবধূ ধ্রুবা, আমরা পাটলিপুত্রে ফিরে যেতে অস্বীকার করছি। নবাভিষিক্ত সম্রাটের কাছে আমার অনুরোধ, যেন এই ভীমনগর দুর্গের দায়িত্বভার রামগুপ্তর হাতে সমর্পণ করা হয়। আর আমাদের জীবিকানির্বাহর জন্য এই পার্বত্যপ্রদেশের কর যেন রামগুপ্তর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আশা করি নবনিযুক্ত সম্রাট তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং তাঁর ভ্রাতৃবধূর জন্য....

'না!' সমগ্র সভা সচকিত হয়ে উঠল মহাদেবী ধ্রুবার তীক্ষ্ণ চিৎকারে, 'আমি রামগুপ্ত এবং রাজমাতা দত্তাদেবীর সঙ্গে একমত হতে অস্বীকৃত হচ্ছি। আমি এই নপুংসক স্বামী আর তাঁর মাতার সঙ্গে আমার জীবন অতিবাহিত করতে পারব না। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই নির্ধারণ করতে পারব। আমি চাই আমাকে সেই অধিকার দেওয়া হোক।

মহারানি দত্তাদেবী এগিয়ে এলেন, 'নির্লজ্জা নারী, এ কী বলছিস তুই? স্বামীহীন স্বৈরিণী জীবন কাটাতে চাস? এই ছিল তোর মনে? এই তোর ধর্ম?'

ধ্রুবা তাঁর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'যে স্বামী নিজস্ত্রীকে বিনা দ্বিধায় শত্রুর রক্ষিতাগারে প্রেরণ করতে পারে, তার ধর্মসঙ্গী হতে আমার ঘৃণাবোধ হয়।' বলতে বলতেই তিনি অন্যান্য সভাসদদের দিকে ফিরলেন, 'পাটলিপুত্র আজ এক অযোগ্য শাসকের অক্ষম শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এখানেই পাটলিপুত্রের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এই ভাগ্যহীনা নারীর ন্যায় বিচারও পাটলিপুত্রকেই করতে হবে। আমি সিংহাসনে বসে ওই থাকা ভীরু কাপুরুষটির ধর্মপত্নীত্বের দায়ভার বহন করতে অস্বীকৃত হচ্ছি।' বলতে বলতে গভীর শ্বাস নিলেন মহাদেবী, মহাবীরাঙ্গনা ধ্রুবা, 'উপস্থিত রাজন্যবর্গ এবং রাজপুরোহিতের কাছে আমি অবিলম্বে এক ধর্ম পরিষদ আহ্বানের দাবি জানাচ্ছি। রামগুপ্তের হাত থেকে আমি "মোক্ষ" চাই।'

সমগ্র পরিষদ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। রামগুপ্ত নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পা অবশ হয়ে এসেছে।

রাজপুরোহিত করজোড়ে বললেন, 'দেবী, আপনার ক্ষোভের কারণ অতি সঙ্গত। কিন্তু ধর্ম-বিবাহ কখনোই অসম্পাদিত করা যায় না। অমোক্ষ হি ধর্মবিবাহম! শাস্ত্রে এর অনুমতি নেই মা, এ হতে পারে না।'

ধ্রুবা দীপ্তস্বরে বললেন, 'অবশ্যই হতে পারে। আমি নবনির্বাচিত সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি, যেন এই মুহূর্তেই এক ধর্ম-পরিষদ আহ্বান করা হয়। রাজপুরোহিতের তুলনায় শাস্ত্রজ্ঞান আর কার বেশি আছে? তিনিই না-হয় ন্যায়বিচারক হোন। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি নিজেই কথা বলব। গুপ্ত সাম্রাজ্য আমার স্ত্রীধন, আমার সম্মান, মর্যাদা সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতার থেকে পাওয়া শাস্ত্র ও ধর্মজ্ঞান এখনও আমার সম্পদ।'

চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মহাদেবী ধ্রুবার অনুরোধে আমি রাজপুরোহিতের নেতৃত্বে এক ধর্ম পরিষদের আহ্বান জানাচ্ছি। মহাদেবীর আবেদনের বিষয়ে এই পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে।'

বিস্ময়াভিভূত রাজন্যবৃন্দ আবার বসে পড়লেন। ধর্মপরিষদ শুরু হল।

রাজপুরোহিত বলেন, 'দেবী, স্পষ্ট জেনে রাখুন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বা রাজদ্বারেও ধর্মবিবাহবন্ধন ছিন্ন করা যায় না। শাস্ত্রানুমতে আপনি নিজের স্বামীর কাছ থেকে মোক্ষ চাইতে পারেন না।'

ধ্রুবার ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল, তিক্তস্বরে বললেন, 'স্বামী! সত্যই তাঁকে এই সম্বোধনে ডাকা যায়?'

রাজেন্দ্রানীপ্রতিম আভিজাত্যে তিনি হেঁটে গিয়ে রামগুপ্তের সামনে দাঁড়ালেন,' 'জিগ্যেস করুন এঁকে, যখন আমি শকরাজের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এঁর কাছে অনুরোধ, না না, অনুরোধ না, ভিক্ষা জানাই, বলি যে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ করার সময় তিনি আমাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছিলেন, তখন ইনি কী বলেছিলেন?'

সভায় সূচীপতনতুল্য স্তব্ধতা।

ধ্রুবা পরিষদের দিকে ফিরলেন, 'উত্তর আপনারা সকলেই জানেন!'

ধ্রুবা আবার বলতে শুরু করেন। এবারে তিনি নারদ, পরাশর ও চাণক্যের শাস্ত্র তুলে উপমা দিতে শুরু করলেন। কোন কোন শর্তাবলির নিরিখে এক নারী, তার ধর্ম বিবাহ থেকে মোক্ষ লাভ করতে পারে। রাজপুরোহিত তাঁর প্রতিটি কথার সমর্থনে মাথা নেড়ে সম্মতি-জ্ঞাপন করতে লাগলেন।

বক্তব্যের শেষদিকে এসে ধ্রুবার উচ্চকিত স্বর সভার প্রতিটি কোণে অনুরণিত হতে লাগল, 'রামগুপ্ত নামের এই ব্যক্তি বিবাহের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। আমার চূড়ান্ত সম্মানহানির কারণ হয়েছে। এবং সর্বোপরি, সর্বোপরি...' বলতে বলতে একটি অতি দীর্ঘশ্বাস নেন ধ্রুবা, যেন সমস্ত মানসিক শক্তি সংহত করছেন। তারপর সুতীব্র স্বরে বললেন, 'সর্বোপরি এই ব্যক্তি একজন নপুংসক, আচার্য চাণক্য যে কারণটিকে মোক্ষ লাভের চূড়ান্ত কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব আমি এই হীনবীর্য, ক্লীব, কাপুরুষটির ধর্মবন্ধন থেকে মোক্ষ চাইছি।'

দত্তাদেবী জ্যা-মুক্ত তিরের মতো ছিটকে উঠলেন, 'স্তব্ধ হ রে কুলটা নারী, আমার পুত্রকে নপুংসক বলিস তুই? এত সাহস?'

নিদারুণ ঘৃণা নিয়ে নিজের শ্বশ্রুমাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন ধ্রুবা। তারপর নিজের স্বরে অনেকখানি করুণা মিশ্রিত করে বলেন, 'আমাকে নয় রাজমাতা, এই প্রশ্ন নিজের পুত্রকে করুন।'

এত মানসিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলেন রামগুপ্ত। তদুপরি অনেকক্ষণ হয়ে গেল মদিরার পাত্র হস্তগত হয়নি তাঁর। কোথায় কখন কী বলা উচিত সেই বোধ তাঁর চিরকালই কম ছিল। ধ্রুবার শেষ বাক্যটি তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল। লাফিয়ে উঠলেন তিনি, 'নির্লজ্জা নারী! তোকে না আমি বলেছিলাম এ কথা কাউকে না জানাতে, অথচ তুই...দেখুন মা দেখুন, কোন অবাধ্য নারীর সঙ্গে আপনারা আমার বিবাহ...' বলতে বলতে কথা থেমে যায় রামগুপ্তর। এ কী বলে ফেললেন তিনি?

সভায় শীতল নীরবতা। ধ্রুবার ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গের হাসি খেলে যায়। তিনি রাজপুরোহিত এবং দনুজদমনের দিকে ফিরে বলে ওঠেন, 'আপনারা স্বকর্ণেই শুনে নিলেন। এইবার এই ধর্ম পরিষদের কাছে আমি ন্যায় বিচার আশা করি।'

রাজপুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন, 'ধ্রুবস্বামিনীর সমস্ত কথা শোনার পরে, আমি তাঁর সমর্থন জানাচ্ছি। তিনি তাঁর পতি রামগুপ্তের থেকে মোক্ষ পাওয়ার অধিকারী।'

রাজপুরোহিত দনুজদমনের দিকে তাকাতে, তিনিও মাথা নেড়ে সহমত জানালেন। চন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার ঘোষণা করলেন, 'দেবী ধ্রুবস্বামিনীকে রামগুপ্তের পত্নীত্ব থেকে মোক্ষ দেওয়া হল। তিনি এখন স্বাধীন, যাঁকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করতে পারেন।'

সমগ্র সভা সমর্থনের কলস্বরে সভা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। শুধু ধ্রুবস্বামিনীকে ছাড়া।

এতক্ষণ ধরে এই মানসিক টানাপোড়েন তাঁকে অন্তর থেকে রিক্ত করে তুলেছে। হঠাৎ মনে হল তাঁর জগৎ যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। এক অসীম ক্লান্তিতে ছেয়ে যাচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব, চৈতন্য। যেন এই জীবন থেকে তাঁর আর কিছু পাওয়ার নেই, কোনওদিনই পাওয়ার কিছু ছিল না।

বিমূঢ়স্তম্ভিত অবস্থায় এতক্ষণ বসেছিলেন রামগুপ্ত। একটু আগেই কী ঘটে গেল সে এখনও মাথায় ঢোকেনি তাঁর। কী বলে ফেললেন তিনি? কী ঘোষণা করলেন রাজপুরোহিত? এক লহমায় সব কিছু হারিয়ে গেল তাঁর জীবন থেকে? সাম্রাজ্য, সম্মান, স্ত্রী সব? তাঁর খেলার পুতুল? তাঁর অবহেলার অহঙ্কার?

আচমকা সম্বিৎ ফিরল রামগুপ্তর। নিজের অসি কোষমুক্ত করলেন তিনি, 'না না, আপনারা এ কাজ করতে পারেন না। আমি গুপ্তবংশের সম্রাট শ্রীরামগুপ্ত। আমাকে এইভাবে সিংহাসনচ্যুত করা যাবে না। আমার সাম্রাজ্য, আমার স্ত্রী, আমার সবকিছু এইভাবে আপনারা ছিনিয়ে নিতে পারেন না।' বলতেই বলতেই তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে গেলেন চন্দ্রগুপ্তর দিকে।

সভার সকলে সচকিত হয়ে উঠল। এই বুঝি একটা অঘটন ঘটে যায়! চন্দ্রগুপ্ত হাত দিলেন তাঁর অসিকোষে, যেন এখনই মুক্ত করবেন তাঁর ক্ষুরধার খড়্গ। কিন্তু তাঁর মুখচোখে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট! শেষ পর্যন্ত কি ভ্রাতৃঘাতী হবেন তিনি?

কিন্তু রামগুপ্তর ভাগ্য তাঁকে তাঁর লক্ষ্য অবধি পৌঁছতে দিল না। তার আগেই ঝলসে উঠল কচগুপ্তর তরবারি। আর মুহূর্তের মধ্যে রামগুপ্তের মুণ্ডহীন শরীর লুটিয়ে পড়ল ভীমনগরের রাজসভার শীতল মেঝেতে।

সভা স্তব্ধ। ধ্রুবাদেবী জ্ঞান হারালেন। সভা জুড়ে শুধু একটাই শব্দ গুঞ্জরিত হল, দত্তাদেবীর আর্তচিৎকার!

গুপ্তবিজয়যাত্রা পাটলিপুত্রে ফিরে এসেছে প্রায় এক মাস হল। আজ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। কাল পূর্ণিমা। নবনির্বাচিত সম্রাটের অভিষেক সম্পন্ন হবে কাল, এই পুণ্য তিথিতে। যথাবিহিত ধর্মীয় আচার এবং উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসব অবশ্য অনেকদিন ধরেই চলছে। মাসাধিককাল পাটলিপুত্রের ঘরে ঘরে অরন্ধনের আদেশ ছিল, প্রজাসাধারণ রাজপ্রাসাদে অন্নগ্রহণ করেছেন।

শীতকাল আগতপ্রায়। বাতাসে তারই আগমনমূর্ছনা। পাটলিপুত্রের পথঘাট ভরে গেছে ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাস আর রিক্তবৃক্ষশাখার বৈধব্যে। সন্ধ্যার বিষণ্ণ বাতাস দ্রুত নেমে আসছে পাটলিপুত্রের শরীর জুড়ে।

রাজপ্রাসাদের ঠিক বহির্দ্বারের কাছে, একটি দ্বিতল আবাসন, প্রধানসড়কের পাশেই। তারই দ্বিতলে বাতায়নের পাশে বসেছিল একটি স্থির, নিষ্কম্প, কৃশকায় শরীর।

কালের নিয়মে ত্রিশটি দিন হলে কী হবে, এই ক'দিনেই ধ্রুবার মনের বয়েস বেড়ে গেছে প্রায় এক দশক। তাঁর এই প্রেতিনীবেশ দেখলে কঠিন পাষাণেরও হৃদয় দ্রব হয়। সেই দেবদুর্লভ কেশরাজি আজ নিষ্প্রাণ পাটতন্তুতুল্য। চোখের কোণে অনিদ্রাজড়িত কালিমা। পরনে অতি সাধারণ কাপাসবস্ত্র। আহারে মন নেই, প্রসাধনে রুচি নেই, এই ধ্রুবাকে দেখে মহাদেবী নয়, যোগিনী বলে ভ্রম হয়।

ভীমনগর দুর্গের সেই ভীমরাত্রির পর অনেক কিছু ঘটে গেছে ধ্রুবার জীবনে। তিনি মোক্ষলাভ করেছেন তাঁর নীচ, ক্লীব, কাপুরুষ পতির দাসত্ব থেকে। গুপ্তধর্মপরিষদ তাঁকে মহাসম্মানে স্বাধীন দেবীরূপে মান্যতা দিয়েছে। তিনি পারতেন তাঁর পিতৃগৃহে সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করতে। স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে।

কিন্তু যাননি ধ্রুবা। গুপ্তবিজয়দলের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন পাটলিপুত্রেই। কেন? কেউ জানে না। অথচ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেননি তিনি। প্রাসাদের বহির্দ্বারের কাছে এই আবাসনে স্থান নিয়েছেন।

মালবরাজ চন্দ্রজ্যোতিও রয়ে গেছেন পাটলিপুত্রেই। তিনি কন্যাঅন্তপ্রাণ। সাধের স্নেহপুত্তলিটির বিন্দুমাত্র অমর্যাদা সহ্য করেন না। তিনিও কঠিন সংকল্প করেছেন ধ্রুবাকে মালবে নিয়ে যাবেন বলে। অবুঝ পিতা

এবং জেদি মেয়ের মধ্যে পিষ্ট হতে হতে মন্দার অবস্থা সঙ্গিন।

চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর। তারই মধ্যে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে দুজন নিম্নস্বরে কথা বলছিলেন। এক কিশোর, আর এক যুবতী। কিশোর প্রশ্ন করলেন, 'কী করা যায় দিদি? আজই তো অভিষেক।'

যুবতী বিষণ্ণস্বরে বললেন, 'জানি না ভাই। ধ্রুবার সংকল্প বড় কঠিন। সে যখন একবার প্রতিজ্ঞা করেছে এই পাটলিপুত্রেই সে নিঃসঙ্গ শেষ জীবন অতিবাহিত করবে, তখন তাকে সেই প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত করা ভারি কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় একটিই। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যদি একবার নিজে গিয়ে অনুরোধ করেন।'

'কিন্তু, কিন্তু ভ্রাতা তো এখন আর কুমার নন। তিনি সম্রাট। তাঁর পক্ষে মহাদেবীর কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া তো অসম্ভব। রাজমর্যাদা বলেও তো একটি বস্তু আছে।'

এরপর দুজনে কিছু গোপন আলোচনা হল। তারপর দুজনেই নিজের নিজের পথ ধরলেন।

চন্দ্রগুপ্ত রাজসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছিলেন। তাঁর রাজ্যাভিষেকের আর কয়েক দণ্ড বাকি। কাল প্রভাত থেকে এই সসাগরা জম্বুদীপের অধীশ্বর হবেন তিনি। অথচ তাঁর মুখে হাসি নেই, চলনে প্রাণের সাড়া নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই। স্বয়ংক্রিয় প্রাণহীন যন্ত্রের মতো অঙ্গবেশ ধারণ করছিলেন তিনি।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। তাঁকে দেখে চন্দ্রগুপ্তর চোখ দুখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, 'মন্দা, তিনি কেমন আছেন? তাঁর কাছ থেকে কোনও সংবাদ এসেছে? তিনি কি রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে সম্মত হয়েছেন?'

মন্দার ওষ্ঠে একটি করুণ হাসি খেলে গেল, 'কোন অধিকারে সে ফিরে আসবে মহারাজ?'

'কেন? পূর্বতন সম্রাটের পত্নী রূপে। সেই অধিকার তাঁর আছে।'

'ভুল করছেন সম্রাট। পূর্বতন সম্রাটের মৃত্যুর আগেই সে মোক্ষ লাভ করেছিল, বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেছিল। সে বিবাহসূত্রেও গুপ্তবংশের কেউ না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত। তারপর ধীর, অতি ধীরস্বরে বলেন, 'জানি মন্দা। তবে কী জানো তো, বৃথা আশা মরতে মরতেও মরে না। আমি চাই সে ফিরে আসুক। যে ঘোর অন্যায় এই রাজপ্রাসাদ তার সঙ্গে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ সে আমাদের দিক।'

'কেন সে ফিরে আসবে মহারাজ? কোন অধিকারে? নিজের দুঃস্বপ্নের স্থানে কেন ফিরে আসবে সে? আপনি নিজেও জানেন, শুধুমাত্র পত্র-প্রেরণই যথেষ্ট নয়। আপনাকে তার কাছে যেতে হবে মহারাজ। তার বুকে যে অভিমানের পাহাড় জমেছে, আপনাকেই সে পাহাড় অতিক্রম করতে হবে।'

মৃদু হাসলেন চন্দ্রগুপ্ত। বড় ম্লান, বড় বেদনাবিধুর সেই হাসি। 'কেন যাই না জানো মন্দা? না, রাজমর্যাদার দোহাই আমি দেব না। জানি বিশ্বাস করবে না, তবু বলি এই দুঃসাহসী চন্দ্রগুপ্ত, জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে রাখা চন্দ্রগুপ্ত ভয় পায়, মহাদেবী ধ্রুবার সম্মুখীন হতে ভয় পায় সে।'

মন্দার চোখ ছলছল করে ওঠে। মিনতির সুরে বলেন, 'জানি মহারাজ, আপনার অবস্থাও বুঝি। তবু বলি, এখান থেকে মুক্তির উপায় এখনও রয়েছে। তবে, সময় চলে গেলে বোধহয় তাও আর পাবেন না। আসুন আমার সঙ্গে।'

ধ্রুবা নিজের কক্ষে একা বসেছিলেন। দীপখানি নিভু নিভু প্রায়। পরিচারিকাদের আজ অব্যাহতি দিয়েছেন। আজ নতুন সম্রাটের অভিষেক, যাক ওরা, অভিষেকে অংশ নিক।

একটু পরেই ধীরে ধীরে এক ছায়ামূর্তি দেখা দিল ঘরের মধ্যে।

ধ্রুবা সেদিকে তাকালেন না। শুধু শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কে, কুমার কচ? সবকিছু কুশলমঙ্গল তো? মহারাজের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হয়েছে তো? এখানে কী মনে করে? মহারাজ উপঢৌকন পাঠিয়েছেন?'

কুমার কচ ধীরে ধীরে নতমস্তকে ধ্রুবার কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'মহাদেবী...'

'আমি গুপ্তবংশের পট্টমহিষী নই কুমার, আমাকে ওই নামে সম্বোধন করবেন না।'

'দেবী...'

'আমি দেবী নই কুমার। এক সামান্যা নারী।'

'রাজকুমারী...'

'আমি মালবদেশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি কুমার। আমি রাজকুমারীও নই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কুমার কচ। তারপর খুব নরম সুরে ডাকলেন, 'দিদি।'

ধ্রুবা চুপ করে থাকলেন। তারপর দু-হাতে মুখ চাপা দিলেন। উদ্‌গত কান্নার স্রোতে তাঁর দেহখানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

কুমার কচ ধ্রুবার পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর নিজের ডানহাতটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই দেখো। কথা দিয়েছিলাম না, তোমার বিপদের দিনে আর কেউ না আসুক, আমি আসব।'

ধ্রুবা দেখলেন কুমারের হাতে তাঁর বেঁধে দেওয়া সেই রক্তবর্ণের অঞ্চলপ্রান্তটি।

'যদি একদিনের জন্যও আমাকে নিজের ভাই বলে মেনে থাকো দিদি, তাহলে আমার কথাটা শোনো। একটিবার আমার সঙ্গে চলো দিদি। জীবনে তোমার কাছে আর কিচ্ছুটি চাইব না। মনে করো কুমার কচ নয়, এক ভাই তার দিদির কাছে কিছু ভিক্ষা চাইছে।'

ধ্রুবা চোখের জল মুছে বললেন, 'কোথায়?'

আবার সেই পাটলিপুত্র রাজপ্রাসাদের উদ্যান। দুটি ছায়ামূর্তি, একজন মালঞ্চবেদীতে, আর একজন হাঁটু গেড়ে প্রথম ছায়ামূর্তির কাছে বসে।

আকাশ পূর্ণচন্দ্রমার আলোয় উদ্ভাসিত। চারিদিক সুগন্ধি ফুলের সুবাসে আমোদিত। একটি রাতচরা পাখি টি টি টি করে ডেকে গেল। একটু পরেই রাজ্যাভিষেকের আয়োজন শুরু হবে। দূর থেকে তার হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'ধ্রুবা, আমাকে ক্ষমা করতে পারো না? মনে করো না, আমরা সেই মালব রাজপ্রাসাদের উদ্যানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর আমি তোমার কাছে বিদায় জানাতে এসেছি। মধ্যবর্তী সময়টুকু নিজের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারো না তুমি?'

ধ্রুবার গলা কেঁপে যায়, 'আপনার করুণা চাই না মহারাজ।'

'করুণা?' ম্লান হাসলেন চন্দ্রগুপ্ত। 'করুণা তো আমাকে করা উচিত ধ্রুবা। যেদিন থেকে আমি তোমাকে হারিয়েছি, সেইদিন থেকে দুর্ভাগ্য আমার নিত্যসঙ্গী। তুমিই আমার নিয়তি ধ্রুবা, আমার রাজলক্ষ্মী। আমার শ্রী!'

'আমি তাই হতে পারি?' তিক্ত হাসলেন ধ্রুবা, 'আমি অন্যপূর্বা। নিজ ইচ্ছায় স্বামীর কাছ হতে মোক্ষপ্রাপ্ত এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা স্বৈরিণী নারী। আমার কাছে কী আশা করেন মহারাজ?'

দু-হাতের তালুতে ধ্রুবার মুখখানি তুলে ধরলেন চন্দ্রগুপ্ত, 'যে অতীত শুধু কষ্ট দেয় তার ছায়া আমাদের মধ্যে আসতে দিও না ধ্রুবা। তুমিই আমার নিয়তি, গুপ্তবংশের ভবিষ্যৎ, গুপ্তসাম্রাজ্যের মহাদেবী। আমরা দুজনে মিলে গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করব। এইই আমাদের ভবিতব্য। জম্বুদ্বীপের ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সন্তান।'

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সেই রাজ্যাভিষেক শত বছর পাটলিপুত্রের স্মৃতিতে অমলিন ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত সেই রাত্রিতেই মহাদেবী ধ্রুবাকে বিবাহ করেন। আর তারপর বহুবছর দুজনে শাসন করেন সমগ্র জম্বুদ্বীপ। তাঁদের এই বীরত্ব, ত্যাগ এবং প্রেমের কাহিনি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

সমাপ্ত